সমন্বিত গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

ভূমিকাঃ প্রতিনিয়তই আমাদের দেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থানের প্রয়োজনেই মূলতঃ কৃষি জমির পরিমাণ কমলেও বাড়ছে মানুষের খাদ্যের চাহিদা। ফলে ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা বর্তমান আবাদযোগ্য জমি থেকে প্রাপ্ত ফলন দ্বারা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রথমতঃ কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ সম্পদের সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না বিধায় কৃষকের আয় বাড়ছে না। ফলশ্রুতিতে কৃষি প্রধান আমাদের এই দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দূরাবস্থায় জীবন-যাপন করছে। এমতাবস্থায় কৃষি জমি ও সম্পদের সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই সম্পদের সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে লক্ষিত জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষ সমপ্রসারণ প্রকল্পের অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে করা হয়েছিল নীচু ধানক্ষেতের মিঠা পনিতে "সমন্বিত চিংড়ি চাষ কার্যক্রম"। কারণ ইতিমধ্যে এই খামার পদ্ধতিটি একটি খুবই লাভজনক ব্যবসায়িক কর্মকান্ড হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

সমন্বিত চিংড়ি চাষ অধিক আয়ের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট ধানের জমিকে গলদা চিংড়ি চাষের উপযোগী করে প্রস্তুত করণের পর সেখানে মিঠা পানির চিংড়ি (গলদা), সাদা মাছ, ধান ও শাক-সব্জি একত্রে চাষাবাদ করাই হচ্ছে "সমন্বিত চিংড়ি চাষ"। অর্থাৎ একটি জমির চারপাশে উঁচু আইল তৈরী করে আইলের ভিতরের দিকে ক্যানেল বা ড্রেনের মতো কেটে পানিকে দীর্ঘদিন আটকে রাখার ব্যবস্থা করে (১-দিক, ২-দিক) সেখানে গলদা চিংড়ি সাদা মাছ (সিলভার কার্প, কাতলা, বিগহেড ইত্যাদি), জমির মাঝখানের সমতল জায়গায় ধান ও আইলে শাক-সব্জি একত্রে চাষ করাই হচ্ছে "সমন্বিত চিংড়ি চাষ"। উল্লেখিত ফসলের মধ্যে গলদা চিংড়িই বেশী মূল্যবান তাই এই চাষ ব্যবস্থাকে "সমন্বিত চিংড়ি চাষ" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সমন্বিত চিংড়ি চাষের গুরুত্ব আমদের দেশের বিভিন্ন জমিতে চাষ করা হয়। যেমনঃ যদি কোন জমিতে ধান চাষ করা হয় তবে ষেখানে শাক-সব্জি চাষ করা হয় না বা জতিতে শাক-সব্জি চাষ করলে ধান চাষ করা হয় না আবার মাছ চাষের জন্য পুকুরকেই নির্বাচন করা হয়। আবার শখের বসে যদি কেই চিংড়ি চাষ করে তবে পুকুরই শেষ ভরসা। এভাবেই চলঠে আমাদের বর্তমান চাষাবাদ অবস্থা। ফলশ্রুতিতে জমির সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে না এবং জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছে না আমাদের চাষী ভাইয়েরা। এমতাবস্থায় সমন্বিত চাষের মাধ্যমে ছোট্ট এক টুকরা জমিকেও টাকার খনিতে রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন ফসল প্রথকভাবে চাষ না করে এক টুকরা ধানের জমিতে একই সাথে গলদা চিংড়ি, মাছ, ধান ও শাক-সব্জির চাষ করার মাধ্যমে একদিকে যেমন জমি থেকে প্রাপ্ত আয় বৃদ্ধি পায় অপরদিকে চাষাবাদের ঝুঁকি/ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায়। নিম্নে একর প্রতি (১০০ শতাংশ) জমির বাৎসরিক আয়ের তুলনামূলক তথ্য প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	ফসল	একক চাষ	সমন্বিত চাষ
১.	ধান	১০,০০০	১০,০০০
২.	চিংড়ি (মিঠা পানির)	-	৬০,০০০
৩.	মাছ	-	৮০০০
৪.	শাক-সব্জি	-	২০০০
	মোট	১০,০০০ (সর্বোচ্চ)	৮০,০০০(নুন্যতম)

সমন্বিত গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতিসমন্বিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি হচ্ছে ধারাবাহিক কার্যক্রমের সমন্বয়। অর্থাৎ কাংখিত ফল পেতে হলে এই চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামান্য অবহেলা আপনাকে অনেক লাভ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার চাষী ভাইয়েরা সমন্বিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতির প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নের সহিত পালন করে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের অতীত দুরাবস্থার থেকে অতি অল্প সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ভালো অবস্থায় আসতে পেরেছে। আর এতে এটি প্রমাণিত হয় যে, পরিশ্রম করলে অবশ্যই সফলতা আসে।
সমন্বিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তা হলোঃ
১. জমি নির্বাচন ও অবকাঠামো তৈরী।
২. জমি প্রস্তুতকরণ / উপযোগীকরণ।
♥ মজুদ পূর্ব ব্যবস্থা
♥ মজুদকালীন ব্যবস্থা
♥ মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থা

৪. নার্সারী পুকুর থেকে জুভেনাইল (ছাটি) মূল জমিতে মজুদ, নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ ও যত্ন নেয়া।
৫. চিংড়ির সাথে অন্যান্য মাছের মিশ্রচাষ।
৬. আইলে শাক-সব্জি চাষ।
৭. নিয়মিত (মাসে দু'বার) চিংড়ির নমুনা পর্যবেক্ষণ।
৮. চিংড়ি আহোরণ ও বাজারজাতকরণ।
৯. চিংড়ি রোগ ব্যবস্থাপনা (সম্ভাব্য)।

জমি নির্বাচন ও অবকাঠামো তৈরী

জমি নির্বাচনঃ
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সমন্বিত চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনায় ধানের সাথে গলদা চিংড়ি, মাছ (সিলভার, কাতলা) ও শাক-সব্জি একত্রে চাষ করা হয়। কিন্তু সব জমিই এই চাষাবাদ ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত নয়। যেমনঃ উচুঁ জমি বা যে জমিতে বালি মাটির পরিমাণ বেশী সে জমিতে পানি ধরে রাখা যাবে না তাই চিংড়ি ও সাদা মাছ চাষ করা যাবে না এবং সমন্বিত চাষ হবে না। তাই প্রথমে জমি নির্বাচন একান্ত জরুরী।

উপযুক্ত জমির বৈশিষ্ট্যঃ
জলাবদ্ধ নিচু জমি বা ধান ক্ষেত ।
যেখানে ৭-১০ মাস বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায়।
যেখানে কাঁদা মাটির পরিমাণ বেশী।
বসত বাড়ির নিকটস্থ জমি।
অবকাঠামো তৈরীঃ
জমি নির্বাচনের পর নির্বাচিত জমিতে সমন্বিত চিংড়ি চাষের উপযোগী অবকাঠামো তৈরী করতে হবে। যেন জমির প্রতিটি অংশই সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়।
অবকাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণঃ
(ক) আইল তৈরীঃ জমির পার্শ্বে পর্যাপ্ত উঁচু (বর্ষাকালে জমিতে আটকে থাকা পানির লেভেল থেকে ১ হাত উঁচু) ও মোটা/চওড়া (উপরে ২ ফুট নীচে ৩ ফুট) আইল তৈরী করে- নিম্নোক্ত সুবিধা অর্জন করা যায়ঃ
জমিতে পানি ধরে রাখা যায়।
চিংড়ি বা মাছ অন্য জমিতে যেতে পারে না।
বাইরের পঁচা ও নোংরা পানি ভিতরে ঢুকবে না।
আইলে শাক-সব্জি চাষ করে পারিবারিক চাহিদা মেটানো ও অর্থ উপার্জন করা যায়।
(খ) ক্যানেল/ড্রেনঃ জমিতে আইলের ভিতরের দিকে আইল থেকে ৩-৪ ফুট জায়গা (বকচর) ছেড়ে দিয়ে ক্যানেল বা ড্রেন (৭-১০ ফুট চওড়া ও ৩-৫ ফুট গভীরতা) তৈরী করে- নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে হবে-
চিংড়ি ও মাছের আশ্রয়স্থল হিবেবে কাজ করবে।
সূর্যের তাপে পানি গরম হলে ক্যানেলের ঠান্ডা পানিতে আশ্রয় নিবে।
শুকনা মৌসুমে জমিতে পানি ধরে রাখা যাবে।
চিংড়ির খাদ্য প্রয়োগের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হবে।
উল্লেখ্য জমির আয়তন ও চাষীর সামর্থ্য অনুযায়ী জমির ক্যানেল তৈরী করতে হবে। জমি বড় হলে কমপক্ষে ৩ দিকে ব্যানেল এবং ছোট হলে ২ দিকে ক্যানেল কাটতে হবে। জমিতে একটু বেশী চওড়া করে ১০-১ ফুট ক্যানেল কাটলে একদিকে হলেও চলবে।

(গ) নার্সারী পুকুরঃ অন্যান্য মাছের রেণুর মত চিংড়ির রেণুকে প্রথমেই চাষের জায়গায় ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ এতে চিংড়ির রেণু বেশী পরিমাণ মারা যায়। তাই রেণুকে বাঁচানোর জন্য অবকাঠঅমো তৈরীর সময়ই নির্বাচিত জমির যে কোন এক পার্শ্বে প্রথম একটি জায়গা তৈরী করতে হবে যেখানে ৩০-৩৫ দিন রেণুকে প্রথকভাবে যত্ন নেয়া যায়। রেণুকে পৃথকভাবে যত্ন নেয়া যায়। রেণুকে পৃথকভাবে রাখার এই জায়গাকেই নার্সারী পুকুর বলে। নার্সারী পুকুর সাধারনতঃ ছোট হলেই ভালো এবং জমির পরিমাণও সম্ভাব্য চিংড়ি মজুদ সংখ্যার উপর পুকুরের আকার নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ ৩ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ এবং ৩-৫ ফুট গভীরতাই উত্তম।

জমির প্রস্তুতকরণ সমন্বিত চাষের জমি প্রস্তুত করা হলো- ধান বা অন্য ফসল উৎপাদনের জন্য জমি তৈরী করা মতো। জমিতে ভাল ফসল পাবার জন্য যেমন আইল ঠিক করা, চাষ দেয়া, আগাছা পরিস্কার করা, সার প্রয়োগ এবং আনুসাঙ্গিক কাজ করে চারা রোপন করতে হয় তেমনই চিংড়ি চাষের জমিতে পোনা ছাড়ার পূর্বে আনুসাঙ্গিক কতগুলো কাজ করতে হয়। এতে করে পোনা উপযুক্ত পরিবেশ পায়। ফলশ্রুতিতে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। তাছাড়াও চিংড়ি চাষে ভবিষ্যতের সমস্যাসমূহ যেমনঃ পানিতে দূষিত গ্যাস সৃষ্টি, চিংড়ির রোগ ইত্যাদির হাত হতে চিংড়িকে রক্ষা করতে চিংড়ি চাষের নির্ধারিত প্লট/জমিকে প্রস্তুত করা একান্ত জরুরী। সুতরাং জমি প্রস্তুতের মাধ্যমে নির্ধারিত প্লট/জমিকে চিংড়ি পোনা মজুদের উপযোগী করে তোলা অর্থাৎ তাদের জন্য একটা সুস্থ্য-সবল পরিবেশ তৈরী করে দেয়া হয়।

ঘের বা খামার প্রস্তুত করার সময় কতগুলো পদক্ষেপ বা ধাপ অনুসরণ করতে হয়, সেগুলো হলোঃ ঘেরের পাড় মেরামত করা
পর্যাপ্ত সূর্যের আলো নিশ্চিত করা ও আগাছা অপসারণ
পেরী বা কাঁদা উঠিয়ে ফেলা
রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ করা
চুন প্রয়োগ করা
সার প্রয়োগ করা
সার প্রয়োগ করা
পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি ও পোনা ছাড়ার উপযোগ্যতা যাচাই

পাড় মেরামত করাঃ জমির পাড়ে যাতে এমন কোন বড় গাছ বা অন্য কিছু না থাকে যাতে পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়তে অসুবিধা হয়। তা'ছাড়া ঘেরের ঢাল বা পাড়ে অনাকাঙ্খিত আগাছা থাকলে, পাড়ে গর্ত থাকলে, বিভিন্ন ধরনের রাক্ষুসে প্রাণী লুকাতে পারে যারা পোনা খেয়ে ফেলতে পারে (যেমনঃ সাপ, উদ, বেজী ইত্যাদি)। তাছাড়া পাড় যাতে ভাঙ্গা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বন্যার পানি বা পাশর্্ববর্তী জমির পানি অনুপ্রবেশ জনিত অসুবিধার সৃষ্টি না হতে পারে। ঘের তৈরীর সময় ঘেরে পানি আসা-

যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। কারণ পানি আসা-যাওয়ার সাথে ঘেরের পানির গুণাগুণ নির্ভর করে।

পর্যাপ্ত সূর্যের আলো নিশ্চিত করা ও আগাছা অপসারণঃ জমিতে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে পারে যা ডুবন্ত বা ভাসমান বা অর্ধ ডুবন্ত যারা পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে খাদ্য উপাদার কমিয়ে ফেলে এবং এরা পর্যাপ্ত সূযের আলো প্রবেশ করতে দেয় না এবং রাতে পানি হতে অক্সিজেন গ্রহণ করার ফলে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয় তাছাড়াও সালোক সংশ্লেষন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী প্রক্রিয়া ব্যহত করে ও আগাছা পচনের বিষাক্ত গ্যাস তৈরী করতে পারে ফলে জমি চিংড়ি চাষের অনুপযোগী হয়ে যায়। তাই জমি প্রস্তুতের সময় এবং পরবর্তী সব সময় এগুলো অপসারণ করতে হবে।

পেরী বা কাঁদা উঠিয়ে ফেলা (মাছ/চিংড়ি চাষকৃত পুরাতন জমি): চিংড়ি ও মাছের উৎপাদনের জন্য চিংড়ি চাষীরা প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার খাবার দিয়ে থাকে। এদর সবটাই চিংড়ি বা সাদা মাছ গ্রহণ করে না। ফলে অবশিষ্টাংশ পঁচে পানির তলায় জমা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ মরে পচে মাটিতে মিশে এবং ঘেরের পাড়ের মাটি তলায় জমে জুচুর কাঁদার সৃষ্টি করে থাকে। এসব থেকে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং এতে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়। চিংড়ি এবং সাদা মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই চিংড়ি চাষের জমি তৈরীর সময় অতিরিক্ত কাঁদা তুলে ফেলতে হয়। উল্লেখ্য নতুন চিংড়ি চাষের জমি হতে প্রথম ৩ বৎসর কাঁদা অপসারনের প্রয়োজন নেই।

রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ করাঃ চিংড়ি খামারে পোনা মজুদের পূর্বেই নিশ্চিত করতে হবে যে, খামারে রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত প্রজাতির মাছ নেই। আর রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ থাকলে ঘের ব্যবস্থাপনা ভালো হবে না। কারণ রাক্ষুসে প্রজাতিরা (যেমনঃ বোয়াল, শোল, টাকী, কই, আইর, কাকিলা, চিতল ইত্যাদি) মাংস ভোজী বিধায় এরা অন্য সকল প্রজাতি ভক্ষণ করে। তা'ছাড়া অবাঞ্চিত প্রজাতি (যেমনঃ মলা, ঢেলা, পুটি ইত্যাদি) এরা রাক্ষুসে নয় কিন্তু চাষযোগ্য পোনার খাবার এবং অক্সিজেন এ ভাগ বসায়।
তা'ছাড়া আমাদের দেশের চিংড়ি চাষীরা পূর্ববর্তী বছরের চিংড়ি রেখে দেন পরবর্তী বছর ভালো বাজার পাবার আশায় কিন্তু গলদা চিংড়ি স্বজাতিভোজী তাই সুযোগ পেলে তারা পরবর্তী বছরের রেণু পোনা খেয়ে ফেলে। এজন্য পূর্ববর্তী পোনা না রাখাই ভালো।
রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত প্রজাতি অপসারণের ক্ষেত্রে চাষীদের আর্থিক ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করে।

নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারেঃ (ক) বারবার জাল টেনে-এতে রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ করা সম্ভব।
(খ) ঘেরের পানি শুকনো- ২/৩ বছর পর পর ঘেরের পানি শুকালে ভাল হবে।
তবে সে ক্ষেত্রে পানির উৎস বিবেচনায় রাখতে হবে।

চিংড়ি চাষের জমি শুকানোর সুবিধাঃ অতিরিক্ত কাদা বা তলানী দূর করা
রাক্ষুসে বা অবাঞ্চিত মাছ অপসারিত করা
সূর্যের তাপে ঘেরের তলদেশের মাটি পুষ্টি সমৃদ্ধ হয়
তলার মাটির বিষাক্ত গ্যাস দূরীভূত হয়, তবে বিবেচনা করতে হবে পুনরায় পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করা যাবে কিনা।

যদি উপরের পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারে রোটেনন প্রয়োগ করা যেতে পারে। (গ) রোটেনন প্রয়োগঃ

প্রয়োগ মাত্রা	আয়তন	গভীরতা	শক্তি	বিষাক্ততার মেয়াদ
১৮-২০ গ্রাম	প্রতি শতক	প্রতি ফুট পানির জন্য	৯.১	৭-১০ দিন
২০-২৫ গ্রাম	প্রতি শতক	ঐ	৭%	ঐ

চুন প্রয়োগ করাঃ চিংড়ি ও মাছ চাষের ক্ষেত্রে চুনের ব্যবহার হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে চুনের গুনের শেষ নেই। যেমনঃ
চুন ব্যবহার মাটি ও পানির ক্ষতির রোগজীবানু ধ্বংস হয়।
চুন প্রয়োগে (চুনে ক্যালসিয়াম থাকে) মাছ ও চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
চুন নিয়মিত ব্যবহারে রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।
চুন প্রয়োগে পানির ঘোলাটে ভাব দূর হয়ে পানির ভিতরে সূর্যের আলো প্রবেশে সহযোগিতা করে ও প্রকৃতিক খাদ্য তৈরীর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।
চুন সারের কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করে।
পানিতে থাকা ব্যাকটেরিয়া পানিতে থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করায় চিংড়ির অক্সিজেনের অভাব হয়। চুন প্রয়োগ করলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাকটেরিয়াগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ফলে তাদের অক্রিজেন ব্যবহার কমে যায়।

প্রয়োগ মাত্রাঃ চুন প্রয়োগ মূলত নির্ভর করে জমির মাটির গুনাগুনের উপর। চিংড়ি চাষের জমি তৈরীর সময় পাথুরে চুন শতাংশে ১ কেজি হারে ব্যবহার করা উত্তম।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ

শুকনা জমির জন্যঃ জমিতে যখন পানি থাকে না অর্থাৎ শুকনা জমিতে পাথুরে চুন গুড়া করে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

পানি থাকা অবস্থায়ঃ চাড়ি বা মাটির গর্তে পরিমানমত চুন ৮-১০ (প্রয়োজনে ৩-৪ ঘন্টা পরে ও ব্যবহার করা যায়।) ঘন্টা পূর্বে ভিজিয়ে গুলিয়ে নিতে হবে। উক্ত চুন ঘেরের পানিতে বা শুকনো ঘেরের চাতাল ও পাড়ের মাঝের খালে ও ঢালে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ করাঃ চুন প্রয়োগের অন্তত ৫-৭ দিন পর জমিতে তলার প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য জৈব সার বা কম্পোষ্ট সার বা সবুজ সার বা প্রয়োজনে অজৈব সার ব্যবহার করা যেতে পারে। জৈব সার হিসেবে হাঁস-মুরগীর বিষ্টা, পানিতে সরাসরি না দিয়ে অন্ততঃ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর প্রয়োগ করা উত্তম। তবে শুকনা জমিতে সরাসরি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চিংড়ি চাষের জমি তৈরীর সময় নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ

প্রতি শতাংশে- পানিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে	প্রতি শতাংশে- পানিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে
গোবর / কম্পোষ্টঃ ৩-৫ কেজি বা	গোবরঃ ৩০-৪০ কেজি
হাঁস-মুরগীর বিষ্টাঃ ২-২.৫০ কেজি	হাঁস-মুরগীর বিষ্টাঃ ১৫-২০ কেজি

ইউরিয়াঃ ১০০ গ্রাম চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খুব একটা প্রযোজ্য নয়।
টিএসপিঃ ১০০ গ্রাম
[বিঃ দ্রঃ এখানে মনে রাখা দরকার যে, সার প্রয়োগের মাত্রা সব সময় ঠিক থাকবে না। অবস্থা ভেদে এর পরিবর্তন করতে হতে পারে।]

পানিতে প্রকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি ও পোণা ছাড়ার উপযোগ্যতা যাচাইঃ

সার প্রয়োগের সময় পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী হয়। পানিতে আনুবিক্ষণীক ও দৃশ্যমান বিভিন্ন প্রকার শেওলা ও প্রণী কনাই হলো প্রকৃতিক খাদ্য। প্রাকৃতিক খাদ্যে চিংড়ির স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরের পানির রং দেখেও পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যর উপস্থিতি বুঝা যায়। প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীর জন্য আলো, তাপ, পুষ্টি পদার্থ ও অনুকুল পরিবেশের প্রয়োজন হয়। পরিবেশের তারতম্যের জন্য এই প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদনেও হ্রা-বৃদ্ধি ঘটে।
প্রাকৃতিক খাদ্যের সঠিক মাত্রা নিূপণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিনের মধ্যে পানিতে খাবার তৈরী হয়েছে কিনা তা বুঝা যাবে। পানির রঙ হালকা সবুজ, লালচে ও বাদামী সবুজ হলে বুঝতে হবে খাদ্য তৈরী হয়েছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী হয়েছে কিনা তা বুঝা যাবে-

সেকী ডিস্ক ব্যবহার করে
স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস ব্যবহার করে
হাত দিয়ে

সেকী ডিস্ক পদ্ধতিঃ

সেকী ডিস্ক পানিতে ডুবানেরা পর-

লাল সুতা পর্যন্ত	বেশী খাদ্য	সার দিতে হবে না, পোণা ছাড়া যাবে না
সবুজ সুতা পর্যন্ত	ভালো খাদ্য	পোণা ছাড়া যাবে, নিয়মিত সার দিতে হবে
সাদা সুতা পর্যন্ত	খাদ্য নেই	সারের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে

হাতের তালু পদ্ধতিঃ সূর্যের আলোয় আলোকিত দিনের ১০-১১ টায় হাতের কনুই পর্যন্ত পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে হাতের তালু / পাতা যদি দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য নেই এবং নিয়মিত সার দিতে হবে। অর্থ্যৎ হাতের তালু না দেখা গেলে বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।
স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে পানি নিয়েও এ কাজ করা যায়।

গলদা চিংড়ির রেণূ মজুদ উল্লেখিত চিংড়ি চাষের জমি প্রস্তুতের ধাপগুলো অনুসরণ করে জমি প্রস্তুত করার পর গলদা চিংড়ির রেণু মজুদের ব্যবস্থা করতে হবে। সমন্বিত চিংড়ি চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়, তার মধ্যে নার্সারী পুকুরে রেণু মজুদ ও এর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রেণু পর্যায়ে এর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ির রেণু মজুদের পর ৩০-৪৫ দিন বেশেষভাবে যত্ন নিতে হবে, তাহলে পরবর্তিতে আর তেমন কোন ঝুঁকি থাকে না এবং রেণু মৃত্যুহার হার খুব কম হয়। ফলে চাষী ভাই তার কাংখিত ফল পায়। আর তাই একজন চাষী ভাইকে গলদা চিংড়ির রেণু মজুদ করার নিয়ম এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে খুব ভালো করে জানতে হবে। **এইজন্য গলদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলোঃ**

গলদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনাঃ

গলদা নার্সারী কি ?

গলদা রেণু পোনাকে বলা হয় পোষ্ট লার্ভা বা পিএল। এই গলদা রেণুকে ছোট আকারের পুকুরে (জমির ভিতরে পৃথক জায়গায়) পরিকল্পিতভাবে লালন-পালন করে কিশোর চিংড়ি (জুভেনাইল বা ছাটি) উৎপন্ন করাকে গলদা নার্সারী বলে।

কেন নার্সারী করা প্রয়োজন ?

গলদা রেণুকে মানব শিশু সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানব শিশুটির (অবুঝ) যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য যেমন আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে থাকি যাতে সে বেড়ে উঠতে পারে সেরূপ রেণুর ক্ষেত্রেও বেশেষ যত্নের প্রয়োজন। কারণ রেণু পর্যায়ে এরা থাকে দুর্বল এবং অসহায়। তার উপর পরিবহনের ফলে সে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তা'ছাড়া রেণু পর্যায়ে সাপ, ব্যাঙ, হাঁসপোকা, রাক্ষুসে মাছ ইত্যাদির হাত থেকে বাঁচার ক্ষমতা তার থাকে না। সে কারনে অপরিকল্পিতভাবে অনেক বড় জায়গায় রেণু মজুদ করলে ৫০-৬০ ভাগ রেণু মরে যেতে পারে বলে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাই রেণু মজুদের গুরুত্বপূর্ণ এবং এত রেণুর মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে যায়।

গলদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনার ধাপঃ

ক. মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনাঃ

নার্সারীর আকারঃ নার্সারী পুকুরের আকার ৫-১০ শতাংশের মধ্যে হওয়া ভালো। এক্ষেত্রে ধান ক্ষেতের ১ টি ক্যানেল বা গর্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

গভীরতাঃ নার্সারী পুকুরের গভীরতা ৩-৪ ফুট এর মধ্যে হলে ভালো কারণ এতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে ও অজ্জনের ঘাটতি থাকে না।

নার্সারী পুকুরের তলদেশ শুকানোঃ গলদা চিংড়ির নাসর্ারীর ক্ষেত্রে পানি অপসারণ করে পুকুরের তলদেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে এবং আগাছা দূর করতে হবে।

চুন প্রয়োগঃ শতাংশে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুর শুকালে চুন গুড়া করে সরাসরি এবং পানি থাকলে পানিতে গুলিয়ে ছিটাতে হবে।

প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীঃ চুন প্রয়োগের ৩-৫ দিন পরে শুধুমাত্র গোবর প্রতি শতাংশে ৩-৫ কেজি পানিতে গুলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

জলজ পোকামাকড় দমনঃ জলজ পোকা যেমনঃ হাঁস পোকা ছোট রেণুর ক্ষতি করে। তাই রেণু ছাড়ার আগের দিন প্রতি শতাংশে ১২৫ মি.লি. ডিজেল বা কেরোসিন পানির উপর ছড়িয়ে দিলে ৪-৬ ঘন্টার মধ্যে হাঁস পোকা সহ অন্যান্য পোকা মারা যায়। পরে চট জাল বা কাপড় দিয়ে কেরোসিনসহ পোঁকা তুলে ফেলতে হবে। পোকা মাকড় দমনের ক্ষেত্রে কোন কীটনাশক অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে না।

চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপনঃ চিংড়ির নার্সারীতে আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করতে হবে।রেণু বাঁচার হার অনেকাংশে নির্ভর করে নার্সারীতে স্থাপিত আশ্রয়স্থলের উপর। চিংড়ির বৃদ্ধি খোলস বদলানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। খোলস বদলানোর সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। চিংড়ির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এরা স্বজাতিভোজী। সব চিঙড়ি একসাথে খোলস বদলায় না। তাই এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যেগুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দুর্বল গুলোকে খেয়ে ফেলে। কাজেই এসময় দুর্বল চিংড়ির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রয়োজন হয়। তাই পোণা মজুদের পূর্বে পুকুরে চিংড়ির জন্য আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আশ্রয়স্থল হিসেবে শুকনো বাঁশের শাখা-প্রশাখাসহ (ঝংলা) উপরের অংশ খুবই উপযোগী। প্রতি শতকে ১-২ টি করে বাঁশের ঝিংলা (বাঁশের শাখা প্রশাখাসহ উপরের অংশ) বা শুকানো ডাল পানিতে ডুবন্ত রাখতে হবে।

আশ্রয় ছাউনী তৈরীঃ নার্সারী পুকুরের পানি যাতে অতিরিক্ত গরম হয়ে না যায় কিংবা পানি গরম হয়ে গেলে চিংড়ির রেণু ঠান্ডা জায়গায় আশ্রয় নিতে পারে সেজন্য নার্সারী পুকুরের উপরে অর্ধেকাংশে নারিকেল পাতা দিয়ে মাচার আকারে ছাউনী দিতে হবে।

খ. মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা-

মজুদ ঘনত্বঃ প্রতি শতাংশে ৫০০-৬০০ টি গলদা রেণু মজুদ করা যেতে পারে। যদি নার্সারীতে ১৫-২০ দিন রেণু লালনের পরিকল্পনা থাকে সে ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ১০০০-২০০০ রেণু মজুদ করা যেতে পারে।

রেণু ছাড়ার সময়ঃ গলদা চিংড়ির পোনা অবশ্যই সন্ধ্যার পর মজুদ করতে হবে। তবে রাত ৮/৯টার মধ্যে মজুদ করা সবচেয়ে ভালো কারন দিনের বেলায় পানির তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যায় ফলে রেণু তার শরীরে তা অভ্যস্ত করাতে পারে না। ফলে রেণু মারা যায়। কিন্তু রাত্রে পানির তাপমাত্রা খুব ধীর গতিতে কমতে থাকে। যা রেণুর জন্য তেমন অসুবিধা হয় না। তাই রেণু রাত্রেই ছাড়া উত্তম। রাতে রেণু ছাড়ার মাধ্যমে ভালো ফল পাওয়া যায় যা কৃষকের মাঠে ১০০ ভাগ পরীক্ষিত।

পোনা অভ্যস্তকরণঃ রেণুকে অবশ্যই পুকুরের পানির সাথে অভ্যস্ত করে ছাড়তে হবে। পাতিল / ব্যাগের পানির তাপমাত্রা ঐ পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতায় না আসা পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। পাত্রের পানি আস্তে আস্তে পরিবর্তন করে পোণাসহ পাত্রটি কাত করলে রেণু স্বেচ্ছায় পানিতে বেরিয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়া ২০-৩০ মিনিট পর্যন্ত চলতে পারে। রেণু পানিতে ছাড়ার ক্ষেত্রে কোনভাবেই তাড়াহুড়া করবেন না, পর্যাপ্ত তাপমাত্রা সঙ্গে রেণুকে খাপ খাওয়াতে হবে। কারণ রেণু বহন পাত্রে ও নার্সারী পুকুরর পানির তাপমাত্রার সমান্য পার্থক্যই রেণুর মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাই ছাড়ার সময় রেণু খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা-

সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগঃ গলদা চিংড়ি প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভর করে না। তাই তাকে প্রতিদিন পম্পুরক খাদ্য দিতে হবে। পোণা মজুদের পর প্রথম ৭ দিন প্রতি ৫০০০ রেণুর জন্য একমুঠ সুজি প্রতিদিন একবার সন্ধ্যায় দিতে হবে। কারণ চিংড়ি সাধারণত রাতেই আহার করে থাকে।

পরবর্তী ২য় ও ৩য় সপ্তাহের জন্য-	১ কেজির তৈরীতে-
মাছের গুড়া / মাংসের গুড়া ৪০%	⇒৪০০ গ্রাম
খৈল (সরিষা / সয়াবিন) ৪০%	⇒৪০০ গ্রাম
চিটাগুড় ১০%	⇒১০০ গ্রাম
এবং গমের আটা ১০%	⇒১০০ গ্রাম

উপরোক্ত পরিমাণে বিভিন্ন উপাদন একত্রে মিশিয়ে কাই তৈরী করে ডিমের আকারে বল তৈরী করে নিতে হবে।
প্রতিটি ডিম আকরের বল প্রতিহাজর রেণুর জন্য সন্ধ্যায় দিতে হবে। প্রতিটি বল আবার চারটি ছোট বল তৈরী করে যেখানে ঝোঁপঝাড় দেয়া হয়েছে সেখানে দিতে হবে। পরবর্তী সপ্তাহ গুলোতে এই খাবারের পরিমাণ ২০% হারে বাড়াতে হবে।

রেণু বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণঃ রেণু বা পিএল ছাড়ার পরদিন পুকুরে গামছা বা মশারীর জালের খন্ড দিয়ে পুকুরের এক কোণায় টেনে রেণুর অবস্থা দেখতে হবে, যদি প্রতি চানে ৪/৫ করে রেণু আসে তবে বুঝতে হবে বাঁচার হার খুবই ভালো। কৃষক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নার্সরী পুকুরে রেণু ছাড়ার পর দুইদিন টিকে গেলে পরবর্তীতে আর তেমন ঝুঁকি থাকে না।
স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণঃ রেণূর স্বাস্থ্য ভালো আছে কিনা এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। পুকুরে গামছা বা মশারীর জালের খন্ড দিয়ে টেনে রেণুর অবস্থা দেখতে হবে, যদি রেনু গুলো খুব দ্রুত নড়াচড়া করে তবে বুঝতে হবেরেণুর স্বাস্থ্য ভাল আছে।
এভাবে ৩০-৪৫ দিনে নার্সারীতে রেণু লালন পালনের পর বড় পুকুরে/ধানক্ষেতে মজুদ করতে হবে।

গলদা রেণু চাষের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ঃ

♣ সন্ধ্যার পর রেণু মজুদ করা।
♣ নার্সারীতে ঝোঁপঝাড় (ঝিংলা) দেয়া।
♣ নিয়মিত সন্ধ্যার পর খাবার দেয়া।
♣ রেণু বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ করা।
♣ নার্সরী পুকুরের যে কোন একপার্শ্বের ছায়ার ব্যবস্থা করা।

হাঁপাতে গলদা চিংড়ির রেণু লালন পালন বা হাঁপা নার্সারী

গলদা চিংড়ির রেণু লালন পালনের জন্য আরো একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলো হাঁপা নার্সরী। হাঁপা নার্সরীর যে কোন পরিস্কার পুকুরেই স্থাপন করা যেতে পারে। অর্থাৎ ছোট নার্সারী পুকুর বা পকেট ঘের (ধান ক্ষেতের একটি ক্যানেল বা খাল) এর সুবিধা না থাকলে এ পদ্ধদিতে গলদা রেণু লালন পালন করে মজুদ পুকুর বা ধানক্ষেতে ছাড়া যেতে পারে।

হাপাঁ নার্সারীর প্রয়োজনীয় উপকরণঃ প্লাষ্টিক ফিল্টার নেট, নাইলন সুতা, বাঁশ, টিনের প্লেট, ঘরে তৈরী সম্পুরক খাবার, নারিকেলের/খেজুরের শুকনো ডাল-পাতাসহ অথবা বাঁশের আগালী (ঝিংলা)।

পদ্ধতিঃ সুক্ষ্ম ফাঁসের প্লাষ্টিকের নেট দিয়ে হাঁপা তৈরী করতে হবে। হাঁপার আয়তন ২ মিঃ ২ মিঃ ১.৫০ মিঃ। এই আয়তন কম-বেশী করা যেতে পারে। এই হাঁপা যে কোন পরিস্কার পুকুরে বাঁশের খুটি দিয়ে স্থাপন করতে হবে। হাঁপা নার্সারীর জন্য ঐ পুকুরে চুন, সার দেওয়ার প্রয়োজন নাই হাঁপটি পানির তলদেশে মাটি থেকে একহাত উঁচুতে স্থাপন করতে হবে এবং পানির উপরে একহাত থাকবে। গলদার রেণুর খাবার প্রয়োগের জন্য নাইলন সুতা দিয়ে টিনের প্লেট এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যাতে খাবারের প্লেট হাঁপার পানির মাঝ বরাবর থাকে। প্রতি হাঁপাতে ২-৪ টি প্লেট ব্যবহার করা যেতে পারে। খেজুরের শুকনো ডাল পাতাসহ প্রতিটি হাঁপাতে ২টি করে দিতে হবে। যাতে গলদার রেণুর আশ্রয়স্থলের কাজ করে এবং খেজুর পাতার ডাল সাত/আট দিন পর পর পরিবর্থন করতে হবে। এবং সাতনি পর পর হাঁপাটিকে পরিস্থার করতে হবে যেন পানিতে আটকানো শেওলা হাঁপাতে লেগে না থাকে।

খাবার প্রয়োগঃ হাঁপাতে যে টিনের প্লেট স্থাপন করা হবে তাতে খাবার দিতে হবে প্রতিদিনে মোট খাবার প্রয়োগের চারভাগের তিভাগ সন্ধ্যায় এবং একভাগ ভোরে প্রয়োগ করতে হবে।

খাবারের উপাদানঃ

শুটকী মাছের / মাংসের গুড়া-	৪০%
সরিষার খৈল	৪০%
ময়দা / আটা-	২০%

উপকরণ তিনটি পানিতে মিশিয়ে ছোটবল আকারে তৈরী করতে হবে এবং এই বল রৌদ্রে ভালো কর শুকিয়ে নিতে হবে। প্রয়োগের সময় বলটি ভালো করে গুড়া কর টিনের প্লেটে দিতে হবে। এভাবে প্রতি হাজার রেণুর জন্য প্রথম সপ্তাহে ৬০ গ্রাঃ হারে, ২য় সপ্তাহে ৮০ গ্রাঃ হারে, ৩য় ও ৪র্থ সপ্তাহে ১০০ গ্রাঃ হারে দিতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সপ্তাহে ১২০ গ্রাঃ হারে খাবার প্রয়োদ করতে হবে। খাবার প্রয়োগের পরিমাণ টিনের প্লেটে খাবারের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে কমানো বাড়ানো যেতে হবে।

মজুদের পরিমাণঃ প্রতি বর্গমিটার জলায়তনে ১০০ থেকে ২০০ টি রেণু মজুদ করা যেতে পারে। মজুদের সময়কালঃ ৪০ থেকে ৪৫ দিন। হাঁপাতে লালন-পালন করে ধান ক্ষেতে বা মজুদ পুকুরে স্থানান্তর করতে হবে।

সতর্কতাঃ

১. অনেক সময় দেখা যায় কাঁকড়া হাঁপার নেট কেটে দেয় তাই সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
২. যেহেতু হাঁপা দীর্ঘদিন পানিতে থাকে তাই হাঁপা তৈরীতে দ্রুত পচনশীল কোন কাপড় ব্যবহার করা যাবে না।

নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ

নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগঃ সমন্বিত চিংড়ি চাষের বিভিন্ন পদক্ষেপ / কার্যক্রমের মধ্যে নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ অন্যান্য মাছের মত চিংড়ি পানি থেকে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণ করতে পারে না। তাই অল্প সময়ে চিংড়িকে বিক্রি উপযোগী করার জন্য নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। নার্সরী পুকুর থেকে মূল জমিতে জুভেনাইল স্থানান্তরের পর থেকে চিংড়ি বিক্রির পূর্ব পর্যন্ত চিংড়িকে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, খাদ্য প্রয়োগ ছাড়া কোনভাবেই চিংড়ি চাষকে লাভজনক করা যায় না।

সম্পূরক খাদ্যঃ

সাধারনতঃ পানিতে সার বা গোবর প্রয়োগ করলে পানিতে প্রাকৃতিক খাবার (উদ্ভিদ কণা ও প্রাণী কণা) উৎপন্ন হয় যা সিলভার কার্প, কাতলা, রুই, জাতীয় মাছ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু চিংড়ি এই সমস্ত খাবার খেতে অভ্যস্ত নয়। তাই এদের জন্য বাইরের থেকে খাবার অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। বাইরের থেকে খাবার প্রয়োগ করাকেই সম্পূরক খাবার বলে।

চিংড়ির জন্য সম্পূরক খাদ্যঃ

চিংড়িকে খাওয়ানোর জন্য বাজারের বিভিন্ন ধরনের প্যাকেটজাত খাদ্য কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই খাদ্যগুলোর দাম অনেক বেশী। যেহেতু চিংড়িকে নিয়মিত খাদ্য দিতে হয় আর একজন চাষী যদি বাজার থেকে চিংড়ি খাবার কিনে খাওয়াতে চান তবে, চাষাবাদ খরচ অনেক বেড়ে যাবে। ফলে চাষীর লাভের পরিমাণ কমে যাবে। তাই বাজার থেকে খাদ্য না কিনে সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে বাড়িতে খাদ্য তৈরী করে চিংড়িকে খাওয়ানোই উত্তম। এতে যেমন খাদ্যের পুষ্টিমাণ নিশ্চিত থাকবে তেমনি খরচও কম (৫০%) হবে। বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে চিংড়ির খাদ্য তৈরী করা যায়। তবে উপাদানের সহজ প্রাপ্যতা ও খাদ্যের পুষ্টিগুণ বিবেচনা করে চিংড়ির জন্য সম্পূরক খাদ্য তৈরীর ৩টি নিয়ম এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

নিয়মঃ ১

উপাদানের নাম	পরিমাণ
মাংস/শুটকী মাছের গুড়া	২৫%
খৈল (সরিষা/সয়াবিন)	২৫%
চাউলের কুঁড়া	২০%
আটা	২৫%
শাক-সব্জি	০৫%
মোট	১০০%

নিয়মঃ ২

উপাদানের নাম	পরিমাণ
মাংস/শুটকী মাছের গুড়া	২৫%
খৈল (সরিষা/সয়াবিন)	২৫%
চাউলের কুঁড়া	২০%
আটা	১৫%
ভুঁষি	১০%
শাক-সব্জি	৫%
মোট	১০০%

নিয়মঃ ৩

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	পরিমাণ
১.	খৈল (সরিষা/সয়াবিন)	৪০%
২.	আটা/ ময়দা	১০%
৩.	চাউলের কুঁড়া	৪০%
৪.	চিটা গুড়	১০%
	মোট	১০০%

উপরোক্ত ছকে উল্লেখিত প্রথম নিয়ম অনুসরণ করে যদি ১ কেজি খাদ্য তৈরী করা হয় তবে মাংসের /শুটকি মাছের গুড়া, খৈল ও আটা ? ময়দা সমান পরিমাণ অর্থাৎ ২৫০ গ্রাম ও ৫০ গ্রাম মিলিয়ে ১০০০ গ্রাম পূরণ করতে হবে। যদি বেশী পরিমাণ খাবার একসাথে তৈরী করা হয় তবে এভাবে সহজেই বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ বের করা যাবে।

খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাদ্য উপাদানের মাধ্যমে বাড়িতে তৈরী করা উত্তম। ছকে উল্লেখিত বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ স্থলিত ৩টি নিয়মের যে কোন একটি বাছাই করে সে মোতাবেক উপাদানগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

তারপর নিম্নোক্ত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে-

♣ খৈলগুলোকে খাবার তৈরীর একদিন আগে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
♣ শাকসজিগুলোকে একটু হালকা সিদ্ধ করে নিতে হবে।
♣ এবার সবগুলো উপাদান (মাংস / মাছের গুড়া, খৈল, চালের কুঁড়া, আটা, ভূষি, শাক-সজি) একত্রে মিশিয়ে ঠিক রুটি বানানোর কাঁই এর মত তৈরী করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন পানির পরিমাণ বেশী না হয়ে যায়।
♣ এবার মেশিন বা ছিদ্রযুক্ত টিনের থালার মাধ্যমে কাইগুলো দিয়ে সেমাই এর মত রৈী করে ১ ঘন্টা সূর্যের আলোতে শুকিয়ে নিতে হবে।
♣ শুকানোর পর এই পিলেটগুলোকে (সেমাইয়ের মত) হাত দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে প্লাষ্টিক জার (বয়াম) টিন বা প্লাষ্টিকের বস্তায় ভরে প্রয়োজন মত চিংড়িকে খাওয়ানো যাবে। প্রতিবার প্রস্তুতকৃত খাদ্য ১৫-২০ দিনের মধ্যে চিংড়িকে খাইয়ে ফেলাই উত্তম। অর্থাৎ প্রতিবার ১৫-২০ দিনের আন্দাজে খাদ্য তৈরী করতে হবে। এতে খাদ্যের পুষ্টিগুণ অটুট থাকবে।

খাদ্য প্রয়োগ পরিমাণঃ

চিংড়িকে তার প্রয়োজন মত খাবার দিতে হবে। কম দিলে চিংড়ির শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং বেশী দিলে অপচয় হবে। যেহেতু চিংড়ি দিন দিন শারীরিকভাবে বড় হবে সেহেতু দিন দিন তার খাবারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। আর এই কারণে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা অনেকে জটিল মনে করে। কিন্তু সহজে এর পরিমাণ র্নিধারণ করা যায়। আকেটি চিংড়ির ওজন যত তার ৫% বা ৫ ভাগ খাবার তাকে দিতে হবে। অর্থাৎ যদি একটি চিংড়ির ওজন ১০০ গ্রাম হয় তবে পরিমাণ হবে ৫ গ্রাম। এভাবে হিসাব করে জমিতে আন্দাপ অনুযায়ী যতগুলো চিংড়ি আছে তাদের অদ্যের পরিমাণ নির্ধারন করে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। তাই মাঝে মাঝে চিংড়ি তুলে আন্দাপ করতে হবে। মজুদের ৮০% বাঁচার

হার ধরে খাদ্য দিতে হবে।
৪-৫ টি চিংড়ির ওজন নিয়েই বুঝতে হবে গড়ে প্রতিটি চচংড়ির ওজন কত হবে এবং জমিতে কি পরিমাণ চিংড়ি আছে তা আন্দাজ করে মোট ওজন কত হবে। সে অনুযায়ী খাবার দিতে হবে।

প্রয়োগের সময়ঃ

সাধারণতঃ চিংড়ি নিশাচর প্রাণী এবং দিনের বেলা থেকে রাতেই চিংড়ি বেশী খাবার গ্রহণ করে। তাই খাদ্যের অপচয় কমানোর জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে চিংড়িকে খাদ্য দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার খাদ্য চিংড়ি চাষের জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগের স্থানঃ

সমন্বিত চিংড়ি চাষের জমির ক্যানেলে যেখানে ঝোঁপঝাড় (ঝিংলা) রাখা আছে সে জায়গাগুলোতে চিংড়ি চলাচল বেশী। তাই খাদ্য প্রয়োগের সময় এ স্থানগুলোতেই ছিটিয়ে দিতে হবে।

চিংড়ির আশ্রয়স্থল তৈরী করাঃ

গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সকল চিংড়ি একই সময়ে খোলস পরিবর্তন করে না। খোলস পাল্টানোর পর দুই ঘন্টা পর্যন্ত চিংড়ি দুর্বল থাকে চিংড়ির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এরা স্বজাতীভোজী তাই এ সময়ে সবল চিংড়ি অর্থাৎ যেগুলো খোলস বদলায় না সেযুলো দুর্বল গুলোকে খেয়ে ফেলে। কাজেই এ সময় দুর্বল চিংড়ির জন্য নিরাপদ আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আশ্রয়স্থল হিসেবে শুকনা বাঁশের শাখা-প্রশাখাসহ (ঝংলা) উপরের অংশ খুবই উপযোগী। প্রতি শতাংশে ১-২ টি করে বাঁশের ঝিংলা বা শুকনো ডাল পানিতে ডুবন্ত রাখতে হবে। চিংড়ির বাঁচার হার অনেকাং শে নির্ভর করে আশ্রয়স্থলের উপর। তাই চিংড়ির জন্য আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা অতীব জরুরী।

চিংড়ির সাথে অন্যান্য মাছের মিশ্রচাষ

মিশ্রচাষ কিঃ

একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসল একসাথে উৎপন্ন করা যায় এবং একটি ফসল অন্যটির জন্য ক্ষতিকর নয় বরং সহায়ক তাই মিশ্র চাষ।

মিশ্রচাষের উপকারিতাঃ

একটি জমি থেকে একই সময়ে একাধিক ফসল পাওয়া যায়।
১. জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়।
২. একটি আরেকটি থেকে সুবিধা পায়।
৩. অর্থনৈতিকভাবে কৃষক লাভবান হয়।
৪. মাটি ও পানির পরিবেশ ভালো থাকে।

কেন মিশ্রচাষঃ

চিংড়ির সাথে অন্যান্য কার্পজাতীয় মাছের চাষ করা চিংড়ির জন্য ভারো। কারণ ধান ক্ষেত বা পুকুর যেখানেরই চিংড়ির চাষ করা হউক না কেন সেখানে কিছু প্রাকৃতিক খাদ্য (সবুজ উদ্ভিদ ও প্রাণী কণা) জন্ম নেয় যা চিংড়ি খায় না। বরং এসব উদ্ভিদ কণিকা রাত্রে পানি থেকে অকিসজেন গ্রহণ করে ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। যা চিংড়ির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অনেক সময় চিংড়ি ব্যাপক হারে মারা যায়। তাই চিংড়ির সাথে কিছু সিলভার কার্প, কাতলা বা বিগহেড জাতীয় মাছ ছাড়লে এরা এই প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং এরা চিংড়ির সম্পূরক খাবারে ভাগ বসায় না। এরা এসব প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে চিংড়িকে বসবাসের উপযোগী করে তুলে। তাছাড়া আরা জানি চিংড়ি পানির নীচের অংশে থাকে এবং সিলভার কার্প, বিগহেড ও কাতলা মাছ পানির উপরে অংশে থাকে তাই চিংড়ির সাথে খাদ্য, আশ্রয় ইত্যাদির কোন প্রতিযোগিতা হয় না।

চিংড়ির সাথে অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের হিসাবঃ

নিম্নে প্রতি শতাংশ জলায়তনে চিংড়ি ও কার্প জাতীয় মাছের মজুদ ঘনত্ব বর্ণিত হলোঃ

ক্রমিক নং	মাছের নাম	পরিমাণ
১.	গলদা জুভেনাইল (ছাটি)	৫০-৬০টি
২.	সিলভার, বিগহেড, কাতলা	১০-১২ টি

চিংড়ির সাথে এই মাছগুলো ছাড়া অন্যান্য মাছ দেয়া যাবে না। কারণ সেগুলো চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর।

আইলে শাক-সব্জি চাষ

শাক-সব্জি চাষের গুরুত্বঃ

আইল হলো জমির একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ যা সাধারণতঃ পতিত ফেলে রাখা হয় ফলে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চি হয় না। সমন্বিত চিংড়ি চাষের বিভিন্ন ফসলের মধ্যে আইলে উৎপাদিত শাক-সব্জি অন্যতম।
আইলে শাক-সব্জি চাষ করলে কৃষক অর্থনৈতিকভবে লাভবান হতে পারে এবং ঝুঁকি কমে যায়। ফলে তাকে দু'শ্চিন্তাগ্রস্থ হতে হয় না। কারণ একটি ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হলেও অন্যটি দিয়ে পুষিয়ে নেয়া যায়। আইলে লতা জাতীয় গাছ যেমন- মিষ্টি কুমড়া, লাউ, শিম, চালকুমড়া, শশা, ঝিংগা, চিচিংগা, বাঙ্গি ইত্যাদি চাষ করলে পারিবারিক চাহিদা জূরণ করা যায় এবং বিক্রি করে লভবান হওয়া যায়। তাছাড়া এসব লতা জাতীয় গাছ পানির উপর মাচা করে চাষ করলে প্রচন্ড রৌদ্রে পানি সহজে গরম হয় না। ফলে চিংড়ির মৃত্যুর ঝুঁকি কমে যায়। তাছাড়া মাচা থাকার কারণে চুরি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। মাচা জাতীয় গাছের পাশাপাশি ঢেঁড়শ, পুঁইশাক, লালশাক, গিমা কলমী, চমেটো, মূলা, গাজর, ওলকপি, ডাটা, পেঁপে, বেগুন ইত্যাদ শাক-সব্জি চাষ করাও অধিক লাভজনক, এগুলি আইলের মাটিকে ক্ষয়রোধ থেকে সহায়তা করে। আগাছা হতে দেয় না। সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি আশ্রয় নিতে

পারে না।
এছাড়া কিছু কিছু সব্জি যেমনঃ গিমা কলমী সিদ্ধ করে চিংড়ির খাবারের সাথে মিশিয়ে চিংড়ির খাবার তৈরী করা যায় যা গুণগতমান সম্পন্ন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমন্বিত চাষাবাদ ব্যবস্থায় যে ফসলগুলো নির্বাচন করা হয় সেগুলো একটি অপরটির জন্য উপকারী। তাছাড়া সমন্বিত চাষের মাধ্যমে জমিকে পরিকল্পিতভাবে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে টাকার খনিতে রূপান্তরিত হয়।

গলদা চিংড়ির নমুনা পর্যবেক্ষণ

নমুনা পর্যবেক্ষণ কি?
একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য নমুনা হিসেবে কয়েকটি চিংড়ি ধরে পর্যবেক্ষণ করা বা দেখাই হচ্ছে নমুনা পর্যবেক্ষণ।

নমুনা পর্যবেক্ষণ কেন করা প্রয়োজন ?
১. শারীরিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি-না তার জন্য নমুনা পর্যবেক্ষণ করা অতীব জরুরী।
২. চিংড়ি রোগাক্রান্ত হচ্ছে কি-না তা দেখার নমুনা পর্যবেক্ষণ।
৩. খাবার প্রায়োগের জন্য নমুনা পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

নমুনা পর্যবেক্ষণ কিভাবে করা যায় ?
১. ১৫ দিন পর পর ঝাঁকি জাল দিয়ে ৫-১০টি চিংড়ি ধরতে হবে।
২. চিংড়িগুলোকে একত্র করে ওজন নিয়ে গড় ওজন বের করতে হবে এবং তা লিখে রাখতে হবে।
৩. পরবর্তী ১৫ দিন পর ওজন নিয়ে আগের ওজনের পার্থক্য দেখে ওজন বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে।
৪. নমুনায়িত চিংড়ি-গুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। চিংড়ির এন্টেনা (দাঁড়ি গোঁফ), রোস্ট্রেম (করাত), লেজ, ফুলকা এবং সাতার পাঁ অঞ্চল ভালোভাবে দেখতে হবে। এসব এলাকা কালো হয়ে যাচ্ছে কিনা বা দাঁড়ি গোঁফ পচন ধরছে কিনা ইত্যাদি দেখতে হবে।
এভাবে ১৫ দিন অন্তর অন্তর নমুনা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গলদা চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণ

গলদা চিংড়ি সাধারণতঃ ৮-১০ মাসের মধ্যেই বাজারজাতকরণ আকৃতিতে পৌছায়। সকল চিঙড়ি একই সময় বাজারজাত আকৃতিতে পৌছায় না। তাই ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান হতে হলে যেগুলি বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়েছে সেগুলো বাজারজাতকরণ করাই উত্তম এবং পর্যায়ক্রমে বাজারজাতকরণ করতে হবে। গলদা চিংড়ি যেহেতু রপ্তানীযোগ্য পণ্য তাই বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

চিংড়ি আহরণের উপকরণঃ
চিংড়ি সাধারণতঃ বেড় জাল, ঝাঁকি জাল দিয়ে আহরণ করা হয়ে থাকে। তবে বৎসর শেষে পাম্প দিয়ে ড্রেন শুকিয়ে চিংড়ি আহরণ করা উত্তম।

আহরণের পর করণীয়ঃ
আহরণের পর দ্রুত বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে চিংড়ি আহরণ করার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোবাবে ধুয়ে নিতে হবে এবং সেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। স্থানীয় বাজারে এগুলো বাজারজাত করা যেতে পারে। তবে দূরে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করে পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
বর্তমানে চিংড়ি বাজারজাতকরণ দুইভাবে করা যায়। মাথাসহ পদ্ধতি ও মাথা ছাড়া পদ্ধতি। তবে মাথা ছাড়ানোর ক্ষেত্রে ভালো অভিজ্ঞতা না থাকলে না ছাড়ানোই উত্তম।

চিংড়ির রোগ ব্যবস্থাপনা
সমন্বিত চিংড়ি চাষ বিষয়ক এই সহায়িকাটিতে উল্লেখিত জমি জ্রন্তত, রেণু মজুদ, নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করলে সাধারণত চিংড়ির রোগ বালাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। তথাপি যদি চিংড়ির রোগ বালাই দেখা দেয় তবে একজন চাষী ভাই যেন সে মূহুর্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সেটা বিবেচনা করে নিম্নে রোগ বালাই ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলোঃ

রোগ হচ্ছে এমন এক অস্বাভাবিক অবস্থ যা কতিপয় লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়। চিংড়ি একটি খোলস বিশিষ্ট জলজ অমেরুদন্ডী প্রাণী এবং বিভিন্ন কারণে অনেক সময় পানিতে প্রতিকুল অবস্থায় তাকে বসবাস করতে হয়। তাই চিংড়ির রোগ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

রোগ সৃষ্টির তিনটি প্রধান বিষয় হচ্ছেঃ
১. রোগ সৃষ্টিকারী জীব (প্যাথজেন)
২. পরিবেশিক প্রতিকুলতা এবং
৩. চিংড়ি / মাছ নিজে
চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য অমেরুদন্ডী প্রাণীদের চেয়ে কম, তাই চিংড়িতে রোগ বেশী হয়।

পরিবেশ ⇒ রোগ বালাই ⇔(চিংড়ি)⇔ রোগ সৃষ্টিকারী জীবানু

ঘেরের পরিবেশ যখন রোগ জীবাণুসহ ভারসাম্য অবস্থায় বসবাস করে তখন সাধারণতঃ চিংড়ির কোন রোগ বালাই হয় না। যদি কোন কারণে দুর্বল / পীড়িত হয়ে পড়ে তখন সহজেই রোহ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘেরের সার্বিক পরিবেশ ভালো থাকলে সাধারণতঃ চিংড়ির কোন রোগ বালাই হয় না।

একটি স্বাভাবিক রোগমুক্ত চিংড়ি দেখতে কি রকম দেখায় ?

♥ পাগুলি দেখতে পরিস্কার এবং সম্পূর্ণ।
♥ শরীর পরিস্কার এবং চকচকে ও সম্পূর্ণ।
♥ খোলস নরম নহে এবং সহজে ভেঙ্গে যাবে না।
♥ ফুলকা পরিস্কার এবং স্বাভাবিক রংয়ের।

রোগের সাধারণ লক্ষণঃ

মাসে একবার জাল টেনে মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিবভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। পুকুরে ঘন ঘন জাল টানা ঠিক না। পুকুরে একবার জাল টানলে মাছ ও চিংড়ির যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করতে এক দুই দিন সময় লাগে।

রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো হলো নিম্নরূপঃ

♥ মাছ ও চিঙড়ির সাধারণ চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়।
♥ মাছ ও চিংড়ি পানির উপরে ভেসে খাবি খায়।
♥ চিংড়ি পানির উপরে চলে আসার চেষ্টা করে।
♥ ফুলকার স্বাভাবিক রং কালো হয়ে যায়।
♥ দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাহ পড়ে।
♥ চিংড়ির খোলসের উপর সবুজ শেওলার স্তর পড়ে।
♥ চিংড়ির হাটার অঙ্গ এবং এন্টেনা (দাঁড়ি) খসে পড়ে অথবা আঁকা বাঁকা হয়ে যায়।
♥ চিংড়ির খোলস নরম হয়ে যায়।
রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিংড়ি ও মাছের বাহ্যিক অবস্থা এবং পুকুরের পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত ভালোভাবে নজর রাখা উচিৎ।

গলদা চিংড়ির কয়েকটি সাধারণ রোগ

চিংড়ির নরম খোলস ও স্পঞ্জের মত দেহঃ

কারণঃ পানিতে ক্যালসিয়াম কমে গেলে এ্যামুনিয়া ও তাপমাত্রা বেড়ে গেলে, পুষ্টিকর খাদ্য কমে হেলে এবং পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে গেলে এ রোগ হয়।

লক্ষণঃ চিংড়ির খোলস নরম হয়ে যায়, উপর থেকে চাপ দিলে নীচে ডেবে যায়।

প্রতিকারঃ

♥ মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে পুকুরে অন্তত ৫০% পানি বদল।
♥ পুকুরে প্রতি মাসে চুন প্রয়োগ। (প্রতি একরে ১৫-২০ কেজি ডলমাইট কৃষি চুণ)
♥ পুকুরে সার ও খাদ্য প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ।

মাথায় ও ফুলকায় কালো দাগঃ

কারণঃ পুকুরে এ্যামুনিয়া ও লৌ হ বেড়ে গেলে এবং খাদ্যে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি কমপ্লেঙ্ কমে গেলে চিংড়ি এ রোগে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণঃ মাথা, ফুলকা, লেজ, এবং উদর খন্ডেও কালো দাহ দেখা যায়।

প্রতিকারঃ

♥ মজুদ ঘনত্ব হ্রাস, পানি বদল (৩০-৫০%)।
♥ চুণ প্রয়োগ (০.৫ কিলো/শতাংশ/প্রতিমাসে।
♥ খাদ্যের সাথে ভিটামিন সি (০.০৩ মি.গ্রা./কেজি), ভিটামিন প্রিমিঙ্ (২৫ মিলি গ্রা./কেজি মিশিয়ে দেওয়া।

চিংড়ির কালো ফুলকা রোগ ও ফুলকা পচন রোগঃ

চিংড়ি যখন আহোনলযোগ্য আকার ধারণ করে তখন তাদের ফুলকার উপর ও নীচে কালো দাগ দেখা যায়। ফলে তাদের ফুলকা পঁচে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হয়। অবশেষে চিংড়ি মারা যায় এবং বাজারে চিংড়ির দাম কম হয়।

কারণঃ পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ কালো মাটি। মাটিতে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের বিস্তৃততি। ফ্যাংগাস এর উপস্থিতি।

লক্ষণঃ ফুলকার রং কালো হয়ে যায় এবং ফুলকা পঁচে যায়।

প্রতিকারঃ

♥ পুকুরে পানি পরিবর্তন (৩০-৫০%)
♥ সম্ভব হলে আশ্রয়স্থল তুলেদিয়ে হররা টেনে গ্যাস অপসারণ করে দেয়া

♥ পুকুরে চিংড়ির ঘনত্ব কমিয়ে দেয়া। খাদ্য নিয়ন্ত্রন করা।

এন্টেনা পচন(দাঁড়ি মোচ পচনঃ)

কারণঃ জৈব পদার্থ (প্রাণী দেহ) পচনের ফলে সৃষ্ট ব্যাকটেরিয়া, দূষিত ও বিষাক্ত গ্যাস (এ্যামুনিয়া, হইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস)।

লক্ষণঃ এনটেনা পচে ক্রমে ক্রমে খাটো হয়ে যায়। এনটেনাতে গিট গিট সৃষ্টি হয়।

প্রতিকারঃ

♥ বড় চিংড়ি ধরে ঘনত্ব কমাতে হবে।
♥ পানি পরিবর্তন, নতুন পানি প্রবেশ।
♥ প্রতি মাসে ২০-২৫ কেজি/একর হারে ডলমাইট বাক্রুষি চুন প্রয়োগ।
♥ শামুকের মাংস প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ। পিলেট জাতীয় খাদ্য প্রয়োগ।
♥ বিকলাঙ্গ রোগঃ

কারনঃ এ রোগের প্রধান কারণ পুষ্টিহীনতা খাদ্যে পুষ্টিকাক দ্রব্যের ঘাটতি। খাদ্যে ট্রেচ ইলিমেন্টের অভাব।

লক্ষণঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমনঃ পা, রোষ্ট্রাম বেঁকে যাওয়া।

প্রতিকারঃ

চিংড়ি ধরে ঘনত্ব কমানো।
প্রোটিন মিনারেল সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগ।

রোগ প্রতিরোধের সহজ পথগুলো হচ্ছে নিম্নরুপঃ

♥ পুকুর নিয়মিত শুকিয়ে পরিমিত মাত্রায় চুন প্রয়োগ।
♥ পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা অপসারণ।
♥ পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান স্থিতিবস্থায় রাখা। প্রয়োজনের বেশী সার প্রয়োগ থেকে চাষীকে বিরত রাখুন।
♥ কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত পোনা মজুদ না করা।
♥ পুকুরের তলায় আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করা।
♥ কোন অবস্থাতেই বেশী পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ না করা।
♥ পুকুরে কোন ক্ষতিকর দ্রব্য না ফেলা।
♥ চিংড়ির বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যের পরিমাণ প্রয়োজন মত বাড়ানো। তাই প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করা।
♥ পুকুর পাড়ে বড় ধরণের গাছ-পালা না রাখা এবং পুকুরে আলো বাতাস পড়ার সুযোগ থাকা।
♥ অল্প পরিমাণে জলজ গাছ থাকা।
♥ চিংড়ির সাথে অল্প পরিমাণে কাতলা, সিলভার কার্প ও প্রাস কার্প ছাড়া।
♥ পনির গভীরতা ৬০-১০০ সেন্টিমিটারে রাখা।

চিংড়ি সম্পর্কে কিছু ভুল ধারনা

সাধারণতঃ কোন বিষয়ের গভীরে না ঢুকে অর্থাৎ বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে উপর থেকে দেখেই আমরা অনেক সময় কিছু ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকি। তদ্রুপ গলদা চিংড়ি সম্পর্কেও আমাদের দেশের অনেক চাষী ভাইয়ের মধ্যে কিছু কিছু ভুল ধারণা কাজ করে। যা মাঠ পর্যায়ের চাষী ভাইদের সাথে আলোচনা করে বেরিয়ে এসেছে। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত গলদা চিংড়ি সম্পর্কে এই সমস্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে চাষী ভাইদের সঠিক ও পরিস্কার ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই কিছু বিষয় তুলে ধরা হলোঃ

সমস্যা সমূহঃ

♥ পানিতে ভেসে উঠে / হাজল উঠা।
♥ সমস্ত চিংড়ি পানির এক কোণে এস উপস্থিত হয়।
♥ চিংড়ি হেঁটে হেঁটে চলে যায়।

উপরোক্ত র্দশ্যগুলো গ্রামাঞ্চলে অনেক চাষী ভাইদের মুখে মুখে প্রচলিত আছে যেমনঃ চিংড়ি হেঁটে হেঁটে চলে এবং এই জন্য কেউ কেউ চিংড়ির বড় দু'খানা পাও ভেঙ্গে দেন। কারণ হেঁটে নলে যাওয়া চিংড়ির বৈশিষ্ট্য নয়। বাস্তবতা হলো এই যে, কখনও কখনও দেখা যায় চিংড়িগুলো পানিতে থেকে পাড়ের দিকে চলে আসার চেষ্টা করছে বা পানি থেকে একটু উপরে মাটিতে উঠে গেছে। এক্ষেত্রে দোষটা চিংড়ির নয় বরং আমাদের। চিংড়ি সব সময় তারজন্য সহনশীল পরিস্কার পরিবেশ পছন্দ করে যা কিনা মানুষ হিসেবে আমরাও করি। আমরা যেমন কোন দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না তেমনি চিংড়িও তার থাকার অনুপযোগী কোন স্থানে থাকতে চায় না। আর তখনই বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়ার চেষ্টা করে এবং মনে হয় চিংড়ি পুকুর থেকে উঠে চলে যাচ্ছে।

কি কি কারণে এমনটি ঘটেঃ

♥ যদি কোন কারনে পানির অক্সিজেন কমে যায়।
♥ যদি কোন কারণে পানি অতিরিক্ত ঘোলাটে হয়ে যায়।

♥ যদি পানিতে কিছু পঁচে নষ্ট হয়ে যায়।
♥ কীটনাশক বা বিষ জাতীয় কিছু পানিতে মিশলে।

উপরের কারণগুলোর জন্যেই চিংড়ির ক্ষেত্রে উল্লেখিত সমস্যাগুলো ঘটে, তবে মূলতঃ অক্সিজেনে স্বল্পতাই এর জন্য দায়ী। পানিতে অন্যান্য সমস্যা না থাকলেও মেঘলা দিনে ঘোমট আবহাওয়া এমনিতেই পানিতে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় এবং তখনও "চিংড়ি পানিতে খাবি খাচ্ছে" (ভেসে উঠা) এমন দৃশ্য চোখে পড়ে। মেঘলা দিনে এমনিতেই বাতাসের চাপ কম থাকে তার উপর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পানি নড়াচড়া করা হয় বা পানিতে ঢেউ সৃষ্টি করা হয় যার ফলে পানিতে অক্সিজেন বৃদ্ধির পরিবর্তে আরো কমে যায়। তাছাড়াও পানিতে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলো পানি থেকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করে ফলে চিংড়ির অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়।

করণীয়ঃ

♥ শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাঃ করে চুন প্রয়োগ, যা অন্যান্য উপকারীতার পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়াগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় ফলে ব্যাকটেরিয়াগুলো পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না।
♥ মেঘলা দিনের ঘোমট আবহাওয়ার সময় পানিতে কখনও ঢেউ সৃষ্টি করা যাবে না।
♥ অতিরিক্ত খাদ্য পানিতে পঁচে পানি নষ্ট করবে এমন কিছু পানিতে ফেলা যাবে না।
♥ সম্বনিত চিংড়ি চাষের জমিতে (ধান বা সব্জিতে) কীটনাশক বা বিষ জাতীয় কিছু প্রয়োগ করা যাবে না। আর ধানক্ষেতে মাছ বা চিংড়ি থাকলে বিষ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না যা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত।

Copyright information © agrobangla .com

পাবদা মাছ একটি বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ। এই মাছ অত্যন- সুস্বাদু এবং জনপ্রিয়। আমাদের দেশে বেশ আগে হাওড়-বাঁওড় -বিলে এই মাছটির পাওয়া যেত। কালের বিবর্তনে প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে এই মাছটি আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। আমরা এই মাছটিকে ব্যাপকভাবে উৎপাদনের জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ২০০২ সালে ব্যাপকভাবে পোনা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছি। এই মাছটি উৎপাদন করতে গিয়ে বিভিন্ন হাওড়-বাঁওড় থেকে জীবিত ব্রুড মাছ সংগ্রহ থেকে শুরু করে, ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা দক্ষ জনবল তৈরি করাসহ ২ বছর ধরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পোনা উৎপাদন ছিল অত্যন- ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয় বহুল একটি কাজ। সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণার হাওড়-বাঁওড় থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ ছিল এক বিরাট ঝুঁকির কাজ। ৫% বেশি ব্রুড মাছ বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। তারপর এই মাছগুলোকে কৃত্রিম খাবারে অভ্যস- করারও ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ একটি পুষ্টিকর খাবার ছাড়া ব্রুড মাছ কখনও ভালমানের বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না। আর সে জন্য এই মাছকে ধীরে ধীরে কৃত্রিম খাবারে অভ্যস- করানো ছিল এক বিরাট সাধনা এবং অভিজ্ঞতাও বটে। প্রতিটি দিনেই যেন এক নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় পুলোকিত বোধ করছিলাম। অবশেষে মাছগুলো কৃত্রিম খাবারে অভ্যস- হল। অন্য কারো পরামর্শ বা প্রযুক্তি ছাড়াই ২০০০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে পোনা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলাম যা আমাদের পরিশ্রমকে সার্থক করে তুলেছে। তারপর ব্রুড থেকে রেনু, রেনু থেকে পোনা উৎপাদন হল। সারা দেশে পোনা বাজারজাত হল। এ থেকে সব খামারিরাই কৃত্রিম খাবারে অভ্যস- পোনা পেল। যা থেকে পরবর্তিতে ব্রুড মাছের সহজলভ্যতা এল। কিন্তু এর পেছনে কত গভীর নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছে তা শুধু আমিই জানি। অবশ্য আমি ব্যবসাও করেছি। এখন স্বল্প পরিসরে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অতিসহজেই আমার প্রযুক্তিতে যে কেউ চাহিদা মাফিক পোনা উৎপাদন করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রজননক্ষম মাছ সংগ্রহ ও পরিচর্যা : পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১০/১১ মাস বয়সে একটি পাবদা মাছ প্রজননে সক্ষম হয়। সুস্থ ও সবল মাছ শতাংশ প্রতি পুরুষ ও স্ত্রী মাছ ৫০ : ৫০ অনুপাতে ৭০/৮০টি মজুদ করে নিয়মিতভাবে দেহের ওজনের ৫% হারে সম্পূরক খাবার দিতে হয়। ৩০% ফিস মিল, ৩০% সরিষার খৈল, ৩০% অটোকুড়া, ১০% ভূষি ও ভিটামিন প্রিমিক্্র সহকারে সম্পূরক খাবার তৈরি করা যায় অথবা বাজারের কৈ মাছের ফিড কাওয়ালেও চলবে।

প্রজননের জন্য উপযোগী স্ত্রী ও পুরুষ মাছ বাছাই : সাধারণত এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে আগষ্ট মাস পর্যন- পাবদা মাছের প্রজনন কাল। এই সময়ে স্ত্রী মাছের পেটে ডিম ভর্তি থাকে। এছাড়াও পাবদা স্ত্রী মাছের পাখনার কাঁটাগুলোর খাঁজগুলো খুব স্পষ্ট নয় যতটা না পুরুষের ক্ষেত্রে। প্রজনন করার জন্য মাছ ও মাছ বাছাইয়ের জন্য স্ত্রী মাছের উদরে ডিম ভর্তি দেখে পরিপক্কতা সম্পন্ন মাছ বাছাই করে নিতে হয়।

হরমোন ইনজেকশনের দ্রবণ তৈরি এবং ইনজেকশন দেওয়ার পদ্ধতি : কৃত্রিম প্রজননের জন্য প্রথমে মাছ বাছাই করতে হয়। এক্ষেত্রে সমপরিমাণ পুরুষ ও স্ত্রী মাছ বাছাইয়ের পর পি.জি. দ্রবণের ইনজেকশন দিতে হয়।

১. প্রথমে প্রজননক্ষম উপযোগী স্ত্রী ও পুরুষ মাছ সমন অনুপাতে হাপাতে ছাড়তে হবে।

২. প্রথম ইনজেকশনের সময় শুধুমাত্র স্ত্রী মাছকে ২/৩ মিঃ গ্রাঃ হারে অর্থাৎ ১ কেজি মাছের জন্য ৩ মিঃ গ্রাঃ পি.জি. এর দ্রবণ পাখনার কাটার নিচে প্রয়োগ করতে হবে।

৩. প্রথম ইনজেকশনের ৬ ঘন্টা পর প্রতি কেজি স্ত্রী মাছের জন্য ৪/৬ মিঃ গ্রাঃ হারে ২য় ইনজেকশন এবং একই সাথে ২য় ইনজেকশনের সময় পুরুষ মাছকে ৪/৬ মিঃ গ্রাঃ হারে ইনজেকশন দিতে হবে। ২য় ইনজেকশনের ৭/৮ ঘন্টার মধ্য সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন ক্রিয়ার মাধ্যমে ডিম ছাড়ে।

পরিত্যক্ত জলাশয়ে জিওল ও মাগুর মাছ চাষ

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পুষ্টি চাহিদা পুরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হচ্ছে। তাই বর্তমানে দেশের প্রতিটি জলাশয় কাজে লাগিয়ে মাছ উৎপাদন করা অতীব জরুরী বিশেষ করে যখন প্রাকৃতিক মৎস্য বিলুপ্ত হয়ে আসছে তখন দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত এবং আগাছাপূর্ণ জলাশয়গুলো পরিচর্যা করে প্রাকৃতিক মৎস্য জিওল ও মাগুর উৎপাদন করে এদের রক্ষা করা সম্ভব।

দেশের মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৫২.৮২ লক্ষ হেক্টর। এই জলাশয়ের মধ্যে মৌসুমী জলাশয়, পথপার্শ্বস্থ ডোবা, জলাধার, বরোপিট ও পাহাড়ী ক্রীক রয়েছে ৫.৭ লক্ষ হেক্টর। এই পরিমাণ জলাশয়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করে জিওল ও মাগুরসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক মৎস্য সংরক্ষণ, উৎপাদন এবং প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি মেটানো সম্ভব। কেননা আমাদের প্রাণীজ আমিষের শতকরা ৬৩% আসে মৎস্য থেকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মাছের মধ্যে জিওল-মাগুরের মধ্যে প্রাণীজ আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি।

যে সকল মৌসুমী পুকুর, থপার্শ্বস্থ ডোবা, জলাধার ও বরোপিট সংস্কার করা হয়ে উঠে না এবং যে জলাশয়গুলোর তলদেশে প্রচুর কাদা থাকে অর্থাৎ অর্থাভাবে এ জাতীয় জলাশয়গুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, সেগুলো ফেলে না রেখে কৈ, জিওল ও মাগুর মাছ চাষ করলে অল্প সময়ে যথেষ্ট ফলন হয় এবং তা বিক্রি করে আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হওয়া যায়। মাত্র ৩-৪ ফুট গভীর জলাশয়ে ৫-৮ মাস এ জাতীয় মাছ চাষ করে বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হয়।

ছবি: মাগুর মাছ

চাষের বৈশিষ্ট্যঃ

* জলাশয় পরিত্যক্ত থাকলে সেখানে নানা প্রকার জলজ আগাছা জন্মায়। পচন প্রক্রিয়ার কারণে এসকল জলাশয়ে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকে না। কিন্তু জিওল ও মাগুর মাছের অতিরিক্ত শ্বসনাঙ্গ থাকার জন্য পানি ছাড়াও এরা বাতাস হতে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে।
* পরিত্যক্ত জলাশয়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায়।
* জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হলেও ভেজা মাটির ছোট ছোট গর্তে জিওল ও মাগুর মাছ আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকে।
* জলাশয় থেকে জিওল-মাগুর মাছ আহরণ করার পরও দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকে। যে জন্য জীবন্ত অবস্থায় তা বাজারজাত করা যায় এবং ক্রেতারা তা কয়েক দিন পানির মধ্যে জীবিত রেখে টাটকা অবস্থায় খেতে পারেন।
* এসব মাছে প্রাণীজ আমিষের পরিমাণ বেশী থাকায় ভোক্তারা প্রয়োজনীয় আমিষ পেতে সক্ষম হন।
* পোনা-প্রাপ্তি সহজ হয়।
* চাষ ব্যবস্থাপনায় খরচ কম।
* পরিত্যক্ত মৌসুমী পুকুর, বরোপিট, পথিপাশর্বস্থ ডোবা ও জলাধারে এ মাছ চাষ করা সহজ।

পোনা-প্রাপ্তি ও অবমুক্তিঃ

সরকারীভাবে জিওল ও মাগুর মাছের পোনা উৎপাদন বা বিক্রির তেমন ব্যবস্থা নেই। বর্ষা মৌসুমে সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রজাতির জিওল ও মাগুর মাছ ডোবা, নালা, হাওড়-বাওড় ছাড়াও ধানের ক্ষেতে সঞ্চিত পানিতে ডিম পাড়ে এবং এ সকল জলাশয় থেকে পোনা পাওয়া যায়। তখন এ সকল স্থান হতে বা বাজারে চারা পোনা উঠলে সেখান থেকে সংগ্রহ করা যায়। সাধারণতঃ ৪-৫ সেন্টিমিটার মাপের জিওলের পোনা প্রতি বর্গ মিটার জলাশয়ে ৬০-৮০টি ছাড়া যেতে পারে। ৫-৮ সেন্টিমিটার মাপের মাগুরের পোনা প্রতি বর্গমিটার জলাশয়ে ৫০-৭৫টি ছাড়া যায়।

খাদ্য সরবরাহঃ

জলাশয়ের তলদেশের কাদা-পাঁক জিওল ও মাগুর মাছের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না। অধিকন্তু ঐ কাদায় যে কেঁচো, শামুক এবং কীট-পতঙ্গের বাচ্চা থাকে তা জিওল-মাগুর মাছ প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি পোনার মোট ওজনের শতকরা ৩-৫% হারে পরিপূরক খাদ্য প্রতিদিন প্রদান করলে মাছের উৎপাদন বাড়ে। তাই, হিসেব অনুযায়ী মোট পরিপূরক খাদ্যের মধ্যে কুঁড়া ৪০% সরিষার খৈল ২০% শুটকি বা শামুকের চূর্ণ ১০% হাঁস-মুরগির নাড়ি-ভুঁড়ি ২০% এবং হাড়ের চূর্ণ বা পশুর রক্ত ১০% একত্রে মিশিয়ে সামান্য পানি দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরী করে জলাশয়ের ৪-৫টি স্থানে (জলার পাড়ের অনতিদূরে) পানির মধ্যে নিক্ষেপ করে অথবা ট্রে-তে করে দেড় ফুট পানির নীচে ডুবিয়ে খাদ্য প্রদান করা যায়।

উপসংহারঃ

দেশে ক্রমাগতভাবে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে অথচ সে অনুপাতে আমিষের উৎপাদন হচ্ছে না। তাই স্বল্প পরিসরে এ দেশের প্রতিটি জলাশয়কে মাছ চাষের উপযোগী করে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে। এর ফলে পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহে জিওল ও মাগুর মাছের উৎপাদন অব্যাহত থাকবে। এতে আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে চাষিরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। এ ব্যবস্থার ফলে লুপ্ত-প্রায় প্রাকৃতিক মৎস্য সংরক্ষণ, আর্থিক লাভ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

মাছের আঁশ থেকে মুক্তা

মাছের আঁশের নির্যাস থেকে তৈরি হচ্ছে মুক্তা। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিউট স্বাদু পানিতে চীনের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের পরিচালনায় মাছের আঁশের নির্যাস থেকে মুক্তা চাষ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন। তবে এখনও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সমপ্রসারণ সম্ভব হয়নি আমাদের দেশে। প্রযুক্তিগত আধুনিক মুক্তা চাষ ব্যবস্থাপনা কলাকৌশলের মাধ্যমে এই শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদন সম্ভব হলে বছরে ১৫০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া ২০ থেকে ৩০ লক্ষ লোকের এ শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

প্রাকৃতিক মুক্তা ও কৃত্রিম মুক্তা:

ঝিনুকের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে মুক্ত জন্মালে তাকে প্রাকৃতিক মুক্তা বলে। আর কৃত্রিমভাবে যে মুক্তা উৎপাদন করা হয় তাকে বলা হয় কৃত্রিম মুক্তা। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে তৈরি মুক্তার মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

কৃত্রিম মুক্তা তৈরির নির্যাস:

মাছের আঁশের উপরের ত্বক থেকে বেরোনো উজ্জ্বল নির্যাসকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃত্রিম মুক্তা তৈরির প্রধান উপাদান হিসেবে ধরা হয়। এই নির্যাসের দীপ্তিকারক উজ্জ্বলতা মাছের উপরের ত্বকের প্রধান জৈব উপাদন গুয়ানিন (২-এ্যামিনো, ৬ অকিইপউরিন রয়েছে) সমৃদ্ধ। মাছের আঁশের উপরের ত্বকে গুয়ানিন থাকার কারণে এটি কলাজেন এবং ক্যালসিয়াম ফসফেটের বিক্রিয়ার ফলে সাদা রূপালি বর্ণ ধারণ করে। এই দীপ্তিকারক রূপালি উজ্জ্বল নির্যাস সাধারণত সামুদ্রিক হোয়াইটিং, সারডিন, হেরিং, রিবন ফিশ এবং মিঠা পানির কিছু কার্প জাতীয় মাছের আঁশে থাকে। সাধারণত এই উজ্জ্বল নির্যাস সারডিন এবং রিবন মাছে বেশি পাওয়া যায়।

শিল্পপ্রধান দেশে এই নির্যাস মুক্তা তৈরিতে ব্যাপক হারে ব্যবহার হয়ে থাকে। উন্নত পরিশোধন পদ্ধতিতে মাছের আঁশ থেকে নির্যাস বের করার পর এতে একরিলিক রাসায়নিক উপাদান মিশ্রিত করে কৃত্রিম মুক্তা তৈরির জন্য ছোট ছোট গ্লাসের গুটিকার প্রয়োজন হয়। নিম্নমানের কৃত্রিম মুক্তা প্লাস্টিক গুটিকা দিয়ে তৈরি করা। গুয়ানিন হল চতুষ্কাণ আকৃত্রির প্লেইটলেটস, স্ফটিক সমৃদ্ধ এবং স-র থেকে স-রে আলো সঞ্চারিত করে উজ্জ্বল কৃত্রিম মুক্তা তৈরি করা হয়। উচ্চমানসম্পন্ন গুয়ানিন তৈরির জন্য নির্যাস স্বচ্ছ পদার্থে ইথাইল এলকোহল প্রয়োগ করা হয়। এরপর পরিশোধিত গুয়ানিনে এসিটোন অথবা এমাইল এসিটেইট, অথবা সেলুলয়েড কিংবা নাইট্রোসেলুলোজ বা এলবুমিনের সাথে মিশ্রণ করে উন্নতমানের কৃত্রিম মুক্তা তৈরি করা হয়। যদিও এলবুমিন জাতীয় প্রোটিন মুক্তার উজ্জ্বলতা তৈরিতে অপরিহার্য তা সত্ত্বেও রাসায়নিক উপাদান মুক্তা তৈরির নির্যাস উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা রাখে। মুক্তা তৈরির প্রধান রাসায়নিক পার্ল নির্যাস গুয়ানিন পানি, এলকোহল, ইথার, ক্লোরোফরম, ইথাইল এসিটেইট, এসিটিক এসিড এবং বেশির ভাগ জৈব এসিডে দ্রবীভূত হয় না। তবে, মিনারেল এসিড এবং এলকালিতেও এটি দ্রবীভূত হয়।

১৬৫৬ সালে ফ্রান্সের জপমালা (ধর্মীয় জপে ব্যবহৃত) প্রস্তুতকারক এক ব্যক্তি ফ্রনকয়েস জাকুইন প্রথমবারের মত মুক্তা তৈরির নির্যাস মাছের আঁশ থেকে উদ্ভাবন করেন। আজ বিশ্বে বিশেষ পরিশোধন পদ্ধতিতে কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদিত হচ্ছে। ফ্রান্সে প্রথম আবিষ্কার হয় বলে ফ্রান্সের ভাষায় একে ' Ôesence d'orient' বলা হয়ে থাকে।

পেসিফিক বৃটিশ কলোম্বিয়া হেরিং ফিসারী কতৃর্ক আহরিত হেরিং মাছের স্কেইল থেকে মুক্তা উৎপাদনের নির্যাস ব্যাপকভাবে উৎপাদন হয়ে থাকে। ১০০ টন হেরিং মাছের ১ টন স্কেইল হতে এক পাউন্ড মুক্তা তৈরির নির্যাস উৎপন্ন হয়।

নির্যাস সংগ্রহ পদ্ধতি:

সামুদ্রিক রিবন ফিশ কিংবা বেল্ট ফিশের আঁশ ধারলো ছুরি দিয়ে ভালভাবে চেঁচে এই রূপালি উজ্জ্বল নির্যাস সংগ্রহ করতে হয়। এই উজ্জ্বল রূপালি নির্যাস পানিতে বারবার নাড়াচাড়া কিংবা ঝাঁকিয়ে উজ্জ্বল গুয়ানিন স্ফটিক সমৃদ্ধ নির্যাস সংগ্রহ করতে হয়। এরপর তলানীতে পড়ে থাকা গাড় তরল পদার্থে অল্প পরিমাণ এসিটিক এসিড এবং ০.২৫ পেপসিন মিশিয়ে ৪৮ ঘন্টা ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিতে হয়। এতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মস্থ করে নেয়া হয় এবং নির্যাসে যে আমিষ কলা রয়েছে তা বের হয়ে আসে। এসিডিফিকেশনের জন্য এসিটিক এসিডও ব্যবহৃত হয়। আবার মেটালিক এসিড প্রয়োগ করলে গুয়ানিন আত্মস্থ করে ফেলে। এরপর ডি- প্রোপিনাইজড গুয়ানিন সমৃদ্ধ স্ফটিক পদার্থ বের করা হয় এবং ইথার দ্রবণ কিংবা গগসোলিন দ্রবণে মিশ্রিত করা হয়। পরে গুয়ানিন সমৃদ্ধ স্ফটিক পদার্থ ভালভাবে জৈব শক্তিসম্পন্ন দ্রাবক স্তর সৃষ্টি হতে পারে। পানিতে মিশ্রিত ময়লা ও কোন বহিরাগত বস্তু পানির স্তরের নিচে ভাসতে থাকে। অল্প সংখ্যক চর্বিজাতীয় পদার্থ ইথার স্তরে অবস্থান নেয়। তখন ইথার স্তর সতর্কতার সাথে পৃথক করা হয়। গুয়ানিন সমৃদ্ধ স্ফটিক পদার্থ শুষ্ক ইথার দ্বারা সাথে সাথে ২ থেকে ৩ বার ধুতে হয় যাতে চর্বি রেরোতে পারে এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে ইথার এবং ইথাইল এসিটেডে সংরক্ষণ করা হয়। রিবন ফিশের দেহের ওজন কমপক্ষে ০.৩% স্কেইল হতে মুক্তার নির্যাস পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট মুক্তার নির্যাস লম্বায় ৩০ মাইক্রোন এবং চওড়ায় ৩ মাইক্রোন ও আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৬ হয়ে থাকে। ফাঁকা গ্লাসের গুটিকায় মুক্তা নির্যাস যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবদ্ধ করে কৃত্রিম মুক্তা তৈরি করার পর গলিত মোম দ্বারা আবৃত করে রাখা হয় কিন্তু এ ধরনের ফাঁকা গ্লাসের গুটিকা দ্বারা সৃষ্ট মুক্তা সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারে। উন্নতমানের মুক্তা তৈরির জন্য অপেল গ্লাস বা এলবাসটার ব্যবহার করা হয়।

রিবন ফিশ ছাড়াও অন্যান্য আঁশযুক্ত রূপালি মাছের আঁশ হতেও মুক্তার নির্যাস প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু হেরিং ও রিবন ফিশের স্কেইল হতে যতটুকু নির্যাস পাওয়া যায় তা অন্যান্য মাছ হতে পাওয়া যায় না। রিবন ফিশ আমাদের বঙ্গোপসাগর এলাকায় প্রচুর পাওয়া যায়। যার কারণে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের কৃত্রিম মুক্তা চাষের উজ্জ্বল সম্ভবনা রয়েছে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

বিকল্প আয়ের উৎস : সামুদ্রিক শৈবাল চাষ

যে জাতি পুষ্টি নিরাপত্তায় যত সবল, সে জাতি পৃথিবীতে তত বেশি অগ্রগামী। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অপুষ্টির শিকার। শুধু ভিটামিন 'এ' এর অভাবে দেশে প্রতি বছর ৩০ থেকে ৪০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্যের জল আয়তনের অর্থনৈতিক এলাকা ৪১,০৪১ বর্গ নটিক্যাল মাইল হতে পারে পুষ্টি নিরাপত্তার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। সফল শৈবাল চাষে উৎপাদিত সামুদ্রিক শৈবাল এনে দিতে পারে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।

রফতানিযোগ্য পণ্য সামুদ্রিক শৈবাল:

বর্হিবিশ্বে সামুদ্রিক শৈবালের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিশ্বে শৈবালের প্রতি বছরে উৎপাদন প্রায় ১০ মিলিয়ন টন যার আর্থিক মূল্য ১২ বিলিয়ন ডলার। এ্যাকুয়াকালচার উৎপাদনে শৈবালের অবস্থান দ্বিতীয়। শৈবাল সম্ভাবনাময় জলজ উদ্ভিদ যার পুষ্টিমান অন্যান্য জলজ প্রজাতির চেয়ে কম নয়।

শৈবাল চাষ, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত:

প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনে প্রায় ১৪০ ধরনের শৈবাল জন্মে। তাছাড়া প্যারাবন এলাকাতেও ১০ প্রকারের শৈবাল পাওয়া যায়। দেশে শৈবাল চাষ একটি সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ এবং এর চাষ পদ্ধতি খুব সহজ। সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে দুটি প্রজাতি Caulera racemosa, Hypnea sp. স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত শৈবাল চাষের সূচনা হয়। গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রনায়ক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক ড. মোহাম্মদ জাফর। তাঁর গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের উপকূলীয় জলরাশিতে শৈবাল চাষ সম্ভব।

শৈবাল চাষে তুলনামূলক সুবিধা:

শৈবাল চাষীদের জন্য স্বল্প বিনিয়োগের নিশ্চয়তা শৈবাল চাষকে সমপ্রসারিত করতে পারে অনেকখানি। গৃহস্থালী উপকরণ (দড়ি, বাঁশ, জার, প্লাস্টিক বয়াঃ) ব্যবহার করে চাষীরা সহজে এ চাষ পদ্ধতি শুরু করতে পারে। জোয়ার ভাটার মাঝের স্থানে অধিকাংশ শৈবাল জন্মায়। সে কারণে ভূমিহীন চাষীগণ খাস সরকারি অনাবাদি জলাভূমিতে বিনা বাধায় চাষ করতে পারবে।

শৈবালের ওষুধি গুণ:

আন-র্জাতিক বাজারে শৈবালের দিন দিন চাহিদা বাড়ছে, কারণ শৈবালে আছে ওষুধিগুণ। শৈবাল টিউমার, রক্তচাপ, হৃদরোগসহ নানা রোগের ঝুঁকি কমায়।

শৈবাল চাষ কেন:

অনুসন্ধানে দেখা যায় প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মানো শৈবাল বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় জনগণ ঐঢ়হবধ শৈবাল কুড়িয়ে, তা শুকিয়ে বিদেশে রফতানি করে এবং কিছু শৈবাল সার হিসেবে ব্যবহার করে। পর্যটকদের অবাধে চলাফেরা, নৌ-চালনা, পাথর আহরন এসব কারণে সেন্টমার্টিন দ্বীপে শৈবালের আবাসস্থলে কিছুটা অসুবিধা হয়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে শৈবাল সংগ্রহ না করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শৈবাল চাষাবাদ করলে শৈবালের গুণগতমান যেমন রক্ষা হয় তেমনি আর্থিকভাবে লাভবানও হওয়া যায়।

বিকল্প আয়ের উৎস:

উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম খুব সীমিত। এ অঞ্চলের জনসাধারণ বেশিরভাগ সময় বেকার থাকে। তারা দৈনিক ভিত্তিতে আয় করে। অর্থ জমানোর সুযোগ থাকে না। ফলে আর্থিক অভাব অনটন তাদের লেগেই থাকে, বাড়ে ঋণের বোঝা। পরিণামে চাষীপল্লীতে পারিবারিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করে। উপকূলীয় অঞ্চলের চাষীদের বিকল্প আয়, স্থিতিশীল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে শৈবাল চাষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

শৈবাল চাষের জন্য বিবেচ্য বিষয়:

১. বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি নির্বাচন

২. সঠিক স্থান নির্বাচন

৩. বাঁশের ফ্রেম তৈরির কৌশল

৪. শৈবাল আহরনের কৌশল

৫. শৈবাল প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল।

শৈবাল চাষ পদ্ধতি:

বাংলাদেশে অনেকগুলো চাষযোগ্য ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শৈবাল হচ্ছে Caulera racemosa, Hypnea sp, Sargassum। শৈবাল চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। লোকজনের আনাগোনা কম ও পরিষ্কার সমুদ্রের পানিতে খুঁটি বসাতে হবে। তারপর খুঁটির দুপ্রান্তে দড়ি আটকিয়ে এবং বাঁশের ফ্রেম তৈরি করে তার মধ্যে জাল লাগিয়ে শৈবাল চাষ করা যায়। দড়ির ফাঁকের মাঝে শৈবাল টিস্যু নরম সুতা দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে যেন পানির স্রোতে ভেসে না যায়।

শেষ কথা:

উপকূলীয় অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন, পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়নে শৈবাল চাষ খুলে দিতে পারে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার নতুন দুয়ার। পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণে নতুন মাত্রা যোগ করে জনগণের পুষ্টির অভাব পুরণ ও রোগ প্রতিরোধে আগামী দিনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে এই শৈবাল চাষ।

লেখক: মো. তৌফিক আরেফীন, কৃষিবিদ, ঢাকা।

তথ্য সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

নদীর উপর ভাসমান খাচায় মৎস্য চাষ পদ্ধতি

জালের খাঁচায় মাছের চাষ খাঁচায় মুরগী পালন বিষয়টির সাথে ইতোমধ্যে আমরা বেশ পরিচিত হয়েছি এবং এই পালন ব্যবস্থাটির প্রসারও ঘটেছে। ছিক এ মুহূর্তে যদি আপনাকে বলা হয় 'জালের খাঁচায় মাছের চাষ' করবেন ? হবে হঠাৎ করে আপনিও সেই সময়কার মতো একটু অবাক হবেন, যেমন খাঁচার মুরগী পালনের জন্য ব্যবস্থাটি কী ত্বরিৎ গতিতে প্রসারিত হয়েছে কত মানুষ আজ এ পেশায় কর্মের সংস্থান করে নিয়েছেন। জালের খাঁচায় মাছের চাষ ব্যবস্থাটিও একদিন এমনি জনপ্রিয় হবে, হাজারও মানুষের কর্মের সংস্থান হবে এ খাতে, আমিষের উৎপাদন বাড়বে, শক্ত হবে জাতীয় অর্থনীতি।

যাদের পুকুর নেই মাছ চাষ আজ আর তাদের জন্য সমস্যাই নয়। জালের খাঁচায় মাছ চাষের আদর্শ ক্ষেত্রই হচ্ছে নদী-নালা, খাল-বিলসহ উন্মুক্ত জলাশয়। যেখানে প্রবল স্রোত নেই অথচ আছে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ। মাছ চাষের জন্য উত্তম জায়গা হচ্ছে এমন উৎসগুলো। মশারির মোত বিশাল আকারের জাল প্রবহমান পানিতে ডুবিয়ে চারকোণা বেধেঁ তাতে ২"- ৩" সাইজের পোনা ছেড়ে মাস চারেক লালন-পালন কলে পুকুরে যে উৎপাদন পাবেন তার অন্তত কৃড়িগুণ বেশি পাবেন এখানে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে, বেশি উৎপাদনের কারণ কি? উত্তর হচ্ছে: পুকুরের পানি বদ্ধ আর এখানকার পানিতে সব সময়ই স্বাভাবিক প্রবাহ আছে। তাই এখানকার পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ পুকুরের চাইতে অনেক বেশি যা মাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। পুকুরে মাছকে সরবরাহকৃত খাবারের উচিছষ্ট এবং মাছের মল জমে পানি কিছুটা হলেও দূষিত করে, এখানে সে সুযোগ নেই। সরবরাহকৃত খাবারের উচ্ছিষ্ট এবং মাছের আবর্জনা জালের সরু ফাঁক দিয়ে প্রবাহিত পানিতে চুয়ে যায় যার ফলে পানি সব সময়ই বিশুদ্ধ থাকছে। পুকুর বদ্ধ হওয়ার জৈব খাবারের পরিমাণ কম। এখানে জৈব খাবার উৎপাদনের সুযোগ অনেক বেশি যা মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। এরকম অনেক উদাহরণ দাঁড়করানো যাবে জালের খাঁচায় মাছের চাষকে জনপ্রিয় করার জন।

আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মাছ চাষের নতুন এই ব্যবস্থাটির প্রবর্তন করেন গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার উলুখেলিক গ্রামের হাবিবুর রহমান। তিনি স্থানীয় বালু নদীতে বহুদিন বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে সফল হয়েছেন এবং এখন তিনি বাণিজ্যিকভাবে এই পদ্ধতিতে মাছের চাষ করছেন। জালের খাঁচায় মাছের চাষে হাবিবুর রহমান সাহেবের প্রাপ্ত ফল থেকেই কারিগরী এই তথ্যগুলো উপস্থাপিত হল: বাংলাদেশে প্রকৃতিগত কারণেই আমার বিশ্বাস, জালের খাঁচায় মাছের চাষ ব্যবস্থাটি জনপ্রিয় হবে। কারণ বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের অর্ধেক পানির নিচে থাকে। এই ৪/৫ মাস সময়ে নদী-নালা, খাল-বিলই হওয়া উচিত মাছ চাষের মোক্ষম স্থান।

খাঁচায় মাছ চাষের সুবিধা দেশের ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, হালদা, সুরমাসহ অধিকাংশ নদ-নদীর বাঁকে এ ধরনের মৎস্য চাষ সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে পানি দূষণমুক্ত, খরস্রোতমুক্ত এবং শত্রুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ করলে সহজেই প্রবহমান নদীর পানি পাওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক উৎস্য থেকেও অনেকটা খাবার পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে পুকুর খনন ও তৈরির অতিরিক্ত খরচ কমে যায়। যেকোনো সময়ই খাঁচার সংখ্যা বৃদ্ধি করে খামার সম্প্রসারণ সম্ভব। নদীর প্রবহমান পানিতে প্রচুর অক্সিজেন থাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া খাঁচার মাছের বর্জ্য পানির স্রোতে অন্যত্র চলে যায়, ফলে পানি দূষিত হয় না। যদিও খাঁচা তৈরিতে কিছু খরচ হয়, তথাপি ভূমির মালিকানা সমস্যা, ভূমি ক্রয় এবং ভূমির ব্যবহার থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ফলে ওই জমি কৃষিকাজে ব্যবহার করা সম্ভব।

খাঁচা কোথায় বসাতে হবে খাঁচা যে কোনো মাপের হতে পারে। ১ বর্গ মি. (২ হাত- ২হাত প্রায়) বা ৫ বর্গ মি. ১০,৫০ বা ১০০.৫০ বর্গ মি. মাপের। এই খাঁচা বড় পুকুরেও বসাতে পারেন। তবে সেখানে সমস্ত পুকুরের আয়তনের মাত্র ৫ ভাগ অথবা ১০ ভাগ ব্যবহারকরতে পারবেন ভালো উৎপাদন যেমন প্রতি ঘনমিটারে (২ হাত- ২হাত - ২হাত প্রায়) ১০ কেজি থেকে ১৫ কেজি। আপনি পেতে পারেন ৪/৫ মাসে। সেখানে খাঁচা বসাতে হবে চলমান খোরা পানিতে। যেমন বর্ষা মৌসুমে যে সমস্ত এলাকা ডুবে যায়, সেখানে অথবা নদীর বাঁকে যেখানে স্রোত থাকে খুব কম। খাঁচা বসাতে পানির গভীরতা থাকতে হবে সর্বনিম্ন ১.২ মি. বা ৪৬ ইঞ্চি তবে সর্বস্ব পানির উচ্চতায় কোনো হিসাব নেই। পানি যতই বৃদ্ধি পাক খাঁচার কোনো অসুবিধা নেই। খাঁচা বসাতে খাঁচার মাপে উপরে একটা বাঁশের ফ্রেম তৈরি করতে হবে এবং চার কোণায় বাঁশ পুঁতে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। পানি বাড়লে খাঁচা তুলে উপরে করে দেবেন, পানি কমলে খাঁচা নিচু করে দেবেন। খাঁচার ওপর খোলা এবং ৫ দিকে জাল এবং পানির উপরে ১ ফুট উঁচু রাখতে হবে।

এই খাঁচা কিসের তৈরিতিন বা চার ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি ফাঁস আকারের মূল পলিথিলিন জাল বা এইচডিপি জাল, খাদ্য আটকানোর বেড় তৈরির জন্য পলিয়েস্টার কাপড়, নাইলনের দড়ি, এক ইঞ্চি জিআই পাইপ, ভাসমান খাঁচার জন্য পিভিসি ব্যারেল বা ড্রাম, খাঁচা স্থির রাখার জন্য অ্যাঙ্কর ও বাঁশ। এই জালের খাঁচা এক বিশেষ ধরনের পলিথিন জাতীয় সুতা থেকে তৈরি। এই জাল সাধাণত গিরাবিহীন মেশিনে তৈরি করা হয়। আবার আপনি চাইলে গিড়া দিয়ে হাতেও তৈরি করে নিতে পারেন। বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করা ঐ জাল বাজারেও পাওয়া যায়। এই পলিথিন সুতার জালের সুবিধা হল, এই জাল কাঁকরায় কাটতে পারে না, পানিতে পচে না। বছরে দুটি ফসল তোলা কোনো সমস্যা নয়। বর্ষা মৌসুমে বিলে আবার শীত মৌসুমে খালে।

খাঁচা তৈরি প্রথমেই জিআই পাইপ দ্বারা সাধারণত (দৈর্ঘ্য ২০ ফুট × প্রস্থ ১০ ফুট × উচ্চতা ৬ ফুট) বা (দৈর্ঘ্য ১২ ফুট × প্রস্থ ১০ ফুট × উচ্চতা ৬ ফুট) সাইজের আয়তকারের ফ্রেম তৈরি করতে হবে। ওই ফ্রেমের প্রতিটি কোণে ১০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি করে জিআই পাইপ ঝালাই করে বসিয়ে দিতে হবে। এরপর ফ্রেমের চারপাশে জাল বেঁধে দিতে হবে। প্রতি দুই ফ্রেমের মধ্যে তিনটি করে প্লাস্টিকের ড্রাম স্থাপন করে পানিতে সারিবদ্ধভাবে ফ্রেমগুলো স্থাপন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক নোঙর দিয়ে খাঁচাটি পানির নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে। এ ক্ষেত্রে জিআই পাইপের স্থলে বাঁশও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে স্থায়িত্বকাল কম হয়।

খাঁচার কী কী মাছের চাষ করা যায়

খাঁচায় কিন্তু সব ধরনের মাছের চাষ করা যায় না বা ভালো উৎপাদন পাওয়া যায় না। হাবিব সাহেব ১৯৮৯ সালে প্রথম ১৮ প্রজাতির মাছ নিয়ে গবেষণা করেন এবং ভালো উৎপাদন হয়।

১. বিদেশী ঘাওর

২. নাইলোটিকা

৩. রাজপুঁটি

৪. কার্প প্রজাতি

৫. পাঙ্গাশ।

এই সমস্ত মাছের গড় উৎপাদন ৪/৫ মাসে প্রতি ঘনমিটার ৫/১৫ কেজি।

কী মাপের পোনা ছাড়তে হবে পোনা সব সময়ই বড় সাইজের ছাড়া ভালো। এতে সুবিধা হল চাষকালীন সময় কম লাগবে, আবার মৃত্যুর হারও কম হবে। পোনা যত বড় সাইজের পাওয়া যায় তত আপনার জন্য লাভজনক। তবে ২ থেকে ৩ ইঞ্চি এর কম হলে চলবে না। কারণ জালের ওপর নির্ভর করে পোনা ছাড়তে হবে।

প্রতি ঘনমিটারে কত পোনা ছাড়বেন এর কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আসল কথা হল আমি কী মাছ ছাড়ব, কত বড় করে কতদিনে বাজরে বিক্রি করব, যেমন ধরুন- নাইলোটিকা মাছের চাষ করব। বাজারে বিক্রিযোগ্য সাইজ ১০০ গ্রাম। আমি উৎপাদন করব প্রতি ঘনমিটারে ১০ কেজি। সেখানে পোনা ছাড়ব প্রতি ঘনমিটারে ১০০টা + ৫% mortality বা ধরে নিব মারা যাবে। তেমনিভাবে যদি আফ্রিকান মাগুর ছাড়তে চাই এবং লক্ষ্যমাত্রা প্রতি ঘন মি. ১৫ কেজি এবং প্রতিটা মাছের গড় ওজন ২৫০ গ্রাম। তবে সেখানে পোনাছাড়তে হবে। ৬০টা + ৫%।

খাঁচায় মাছের কী কী খাদ্য দিতে হবে প্রাণী মাত্রই খাদ্য দরকার। খাদ্য ছাড়া কোনো প্রাণী বাঁচে না। খাঁচায় অধিক ঘনত্বে মাছ থাকে বিধায় তা প্রয়োজনের সবটুকু খাদ্য আপনাকে বাইরে থেকে দিতে হবে। যদিও চলমান বা খোলা পানিতে কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীকণা সব সময়ই আসে। তবে তা যথেষ্ট নয়। অনেক অনেক বিল বা খাল এলাকায় কোনো মৌসুমে প্রচুর উদ্ভিদ কণার জন্ম হয় যে অল্প ঘনত্বে মাছ ছেড়ে বিনা খাদ্যেই প্রতি ঘন মি. ৪/৫ মাসে ৫/৭ কেজি মাছ উৎপাদন করা যায়। তবে সুষম খাদ্য হিসাবে মাছকে দৈনিক ২/৩ বার খাবার দিতে হবে। এখানে থাকবে প্রাণিজ আমিষ, যেমন- শুটকি মাছ শামুকের মাংস অথবা গরু-ছাগলের রক্ত অথবা মাংসের ছাটি অথবা গরু-ছাগলের নাড়ি-ভুঁড়ি ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত খৈল। যে কোনো খৈল, সরিষা, তিল নারকেল বাদাম সয়াবিন, তিসি, তুলা ইত্যাদি। উচ্ছিষ্ট ভাত। এছাড়া প্রচুর ঘাস খায় নাইলোটিকা, গ্রাস কার্প ও রাজপুঁটি। বর্ষাকালে আমাদের দেশের নিম্ন বিলাঞ্চল ভারে থাকে নানা ধরনের ঘাস। এ সমস্ত ঘাসের মধ্যে নরম ঘাস, যেমন- রাইদা, ইছাদল, পোটকা প্রভৃতি। সুষম খাদ্য তৈরি করতে দিতে হবে শটকি অথবা যে কোনা প্রাণিজ আমিষ ১০-৩০%, খৈল ২০-৪০%, গমের ভুষি/মিহি কুঁড়া ২০-৫০% তার সাথে ৫% চিটাগুড় ও ৫-১০% সস্তা দামের আটা ও ০.৫% ভিটামিন। খাবার তৈরি করারসময় একটুকু পানি মিশাবেন যেন খাবারটা মাখতে মাখতে সাবানের মতো শক্ত বলে পরিণত হয়। মাছ সেই বল থেকে কামড় দিয়ে খাবার নেবে। যদি খাদ্য ও পানি ভালোভাবে মিশে শক্ত বলে পরিণত না হয় তবে খাদ্য পানিতে গুলে যাবে। মনে রাখতে হবে তৈরি বল ১৫-২০% মিটার পর্যন্ত পানিতে যেন না গলে। এভাবে খাদ্য তৈরি করে বাঁশের ঝুড়িতে করে খাঁচার মধ্যে পানির ১ হাত নিচে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। মাছ ৫-১০ মিনিটের মধ্যে সমস্ত খাদ্য শেষ করে ফেলবে।

দৈনিক কী পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে মাছ তার দৈহিক ওজনের গড়ে ৩-৫% খাদ্য খায়। তবে ১ গ্রাম থেকে ২০ গ্রাম পর্যন্ত পৌছতে ১০-২০% পর্যন্ত খাদ্য খায় এবং এই সময় তবে বাড়তিও বেশি হয়। গড়ে সুষম খাদ্য দিয়ে ১ কেজি মাছ উৎপাদন করতে ২/৩ কেজি খাদ্য দরকার হয়। হবে খাবারের সাথে সাথে কাঁচা গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা ও প্রচুর ঘাস দিলে খাদ্য খরচ অনেক কমে যায়।

উৎপাদন কেবল খাঁচায় চাষ করলে অল্প মূলধনে, অল্প সময়, অল্প খরচে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। উন্নত বিশ্বে বিজ্ঞানীরা আজ প্রতি বর্গমিটা প্রতি মাসে ১০ কেজি মাছ উৎপাদন এ হিসাবে দাঁড়ায় প্রতি বিঘায় মাসে ১০ মেট্রিক টন বা ১০ হাজার কেজি। এর মদ্যে স্থায়ী খরচ ৬ হাজার ৫শ' টাকা বাদ দিলে মোট মুনাফা ১৯ হাজার ৬শ' ৫০ টাকা প্রতি খাঁচায় প্রতি ৩/৪ মাসে।

খাঁচায় মাছ চাষ করতে রাত-দিন সব সময় দারোয়ান অবশ্যই থাকতে হবে। কেননা অল্প জায়গায় এত অধিক মাছ থাকায় চুরির সম্ভাবনা বেশি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই চাষ বাংলাদেশে অধিক লাভজনক। যেহেতু এই চাষ ব্যবস্থাটি আমাদের দেশে এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। তাই এই তথ্যগুলোর জনাব হাফিজুর রহমানের গবেষণা থেকে নয়।

খাঁচা তৈরির সম্ভাব্য খরচ ও মাছের উৎপাদন ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি খাঁচা তৈরিতে খরচ হয় প্রায় ১৬ হাজার টাকা, যা চার-পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। মাছের আকার ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম হলেই বিক্রির উপযোগী হয়, আর এ ক্ষেত্রে সময় লাগে মাত্র ছয় মাস। এ ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটারে কমপক্ষে ৩০ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়ে থাকে। সাধারণত চাষকৃত পোনার ওজন ১০ গ্রাম হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে আকারে বড় অর্থাৎ ২০ থেকে ৩০ গ্রাম ওজনের পোনা চাষ করলে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া যায়। খাঁচা তৈরি, পোনার মূল্য, খাদ্য, শ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে প্রতি ১০টি খাঁচা থেকে প্রতি ছয় মাসে কমপক্ষে এক লাখ ১০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব।

সম্ভাবনা পতিত জমিতে (নদী, হাওর, বিল) মাছের উৎপাদন সাধারণ জমিতে স্থাপিত খামারের তুলনায় প্রায় ১৩ গুণ বেশি হয়। সাধারণ পুকুরে বা খামারে এক একরে যে পরিমাণ মাছ চাষ করা যায় সেই পরিমাণ মাছ উৎপাদনের জন্য খাঁচায় মাত্র ১৮০ ঘনমিটার জায়গাই যথেষ্ট। খাঁচায় যেখানে প্রতি হেক্টরে তিন লাখ কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব, সেখানে পুকুরে বা খামারে প্রতি হেক্টরে মাত্র ২৩ হাজার কেজি মাছ উৎপাদন হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশের মাছের চাহিদা প্রতি বছরে প্রায় ৩০ লাখ টন। খাঁচায় মাছ চাষ করলে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে মাত্র ১০ হাজার হেক্টর জমিই যথেষ্ট, যা আমাদের দেশের পতিত মোট নদ-নদীর পানির মাত্র শতকরা ০.২৫ ভাগ।
এগ্রোবাংলা ডটকম